শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার ত্রৈমাসিক

আল-আমীন বার্তা

জানুয়ারি-জুন ২০২০

স্মরণ

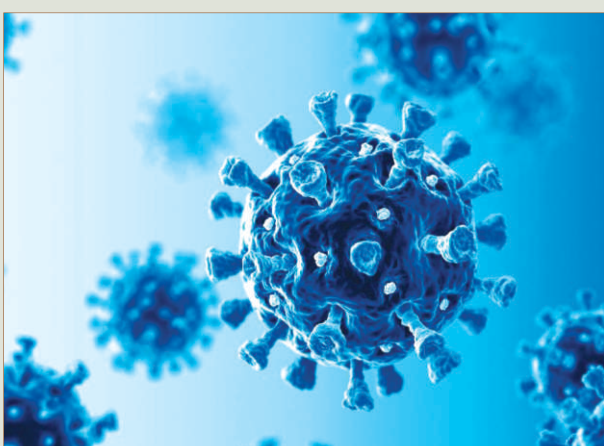

সাবধানে থাকুন ভালো থাকুন

আমাদের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে
এই আপৎকালীন সময়টুকু
সমস্ত রকমের সাবধানতা অবলম্বন
করে চলা এবং সুদিনের আশায়
ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা।

OUR ACHIEVEMENTS

AWARDS

The West Bengal Government has conferred **Bangabhusan Award** to Al-Ameen Mission for its outstanding contribution in the field of education for the minority community of the state. In presence of the Hon'ble Governor Mr Keshari Nath Tripathi, the Hon'ble Chief Minister of West Bengal Ms. Mamata Banerjee handed over this award on 20th May 2015. The General Secretary, M Nurul Islam received award on behalf of Al-Ameen Mission. Hon'ble Ministers Mr Firhad Hakim & Mr Aroop Biswas were also present.

In 2006, the Mission was awarded the **Begum Rokeya Puraskar** launched by West Bengal Board of Madrasah Education.

Al-Ameen Mission has been awarded **The Telegraph School Award for Excellence** in 2002 and 2009 sharing with The South Point High School, Kolkata. It also got The Telegraph School Award for Excellence for the best academic performance in competitive examinations in 2004 and the Certificate of Honour in 2005, 2006 and 2008.

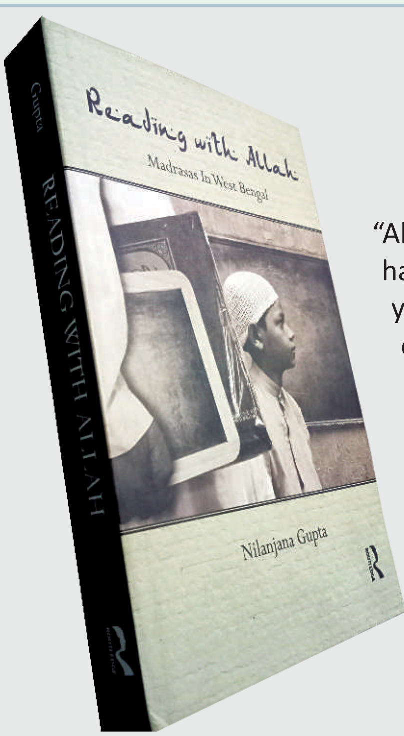

QUOTES

Reading with Allah, *Madrasas In West Bengal*
by Prof. Nilanjana Gupta, Dept. of English, Jadavpur University,
Published by Routledge, 2009

"Al-Ameen has not only become a successful educational institute in itself, it has actually spawned a movement which is growing and spreading every year all over West Bengal. ... If education is seen as a means for ensuring empowerment for sections of society, then the work of Al-Ameen is fulfilling that role."

Changes from within (Chapter 4), Pages 129-130

"... it is true that the need and the hunger for learning, for education is intense, whether in the efforts of the poor farmer to send his children for some kinds of education, or the grander vision of people like Nurul Islam of the Al-Ameen Mission. ... Then perhaps, one day, the debates about Muslim education may become merely a quaint chapter in the history of education in India."

The Future (Chapter 5), Pages 179-180

আল-আমীন বার্তা

পৌষ ১৪২৬-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ | জানুয়ারি-জুন ২০২০
জমাদিউল আওয়াল-শওয়াল ১৪৪১ ● দশম বর্ষ ● প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা

পরামর্শ পরিষদ
একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান সেখ মারুফ আজম
এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
দিলদার হোসেন একরামুল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ
মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ
আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স
মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা ● **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯, ৭৪৭৯০ ২০০৭৬
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.org
facebook.com/alameen.barta

স্মরণ ১

উপন্যাস লিখতে বসে লেখক কাহিনি খুঁজে বেড়ান, দেবেশ রায় প্রকৃতির কথা খুঁজে নিয়ে আসতেন। বলতেন, মৌসুমি বায়ুর সঙ্গে মানুষের জীবন যেভাবে অন্বিত, তা নিয়েও উপন্যাস লেখা যাবে না কেন? সাহিত্যের ভূমণ্ডলে এমন ব্যতিক্রমী লেখকদেরই যুগে যুগে অগ্রপথিকরূপে বরণ করা হয়েছে।

লিখেছেন **অমর মিত্র**

৬ পাতায়

দেবেশ রায়
মানচিত্রের বাইরে থাকা লেখক

স্মরণ ২

শিক্ষা আর সংস্কৃতিজগতের মানুষ হয়ে তাঁর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি বাংলাদেশে আর-কেউ পাননি। বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিরল গুণসম্পন্ন এই মানুষটির মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হল বাংলাদেশের একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের।

লিখেছেন **একরাম আলি**

১০ পাতায়

আনিসুজ্জামান
একটি সাংস্কৃতিক অধ্যায়ের সমাপ্তি

স্মরণ ৩

সাহিত্যের সব ক-টি অলিন্দে তাঁর যাতায়াত ছিল উচ্চ মননশীলতার আবহে পূর্ণ। ফিল্মেও তিনি ছিলেন সমান স্বচ্ছন্দ বহুপ্রশংসিত। এমনই সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি জগৎকে দেখার চোখ ছিল প্রখর যুক্তিপূর্ণ। প্রবল বনাম দুর্বলের ক্ষেত্রে সবসময় তিনি জানার চেষ্টা করেছেন দুর্বল কেন দুর্বল। থেকেছেন সত্যেরই পক্ষে।

লিখেছেন **বুলবুল আহমেদ**

সুরজিৎ দাশগুপ্ত
প্রগতির ক্লান্তিহীন পথিক

৩০ পাতায়

উজ্জ্বল প্রাক্তনী

গত চৌত্রিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় সহকারী অধ্যাপক আয়াতুল্লা ফারুক মোল্লা

গণ্ডগ্রাম থেকে গবেষণা-বিশ্বে

লিখেছেন

আসাদুল ইসলাম

১৫ পাতায়

অনন্য ব্যক্তিত্ব

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল প্রাপ্তির খবরে আব্দুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব, সংক্ষেপে জে-প্যাল-এর নাম আমরা সকলেই শুনেছি। কিন্তু সেই পরিসরে উক্ত প্রতিষ্ঠান নিয়ে পত্র-পত্রিকায় দ্বিতীয় কোনো বাক্য উচ্চারিত না-হওয়া বিস্ময়ের।

লিখেছেন

একরামুল হক শেখ

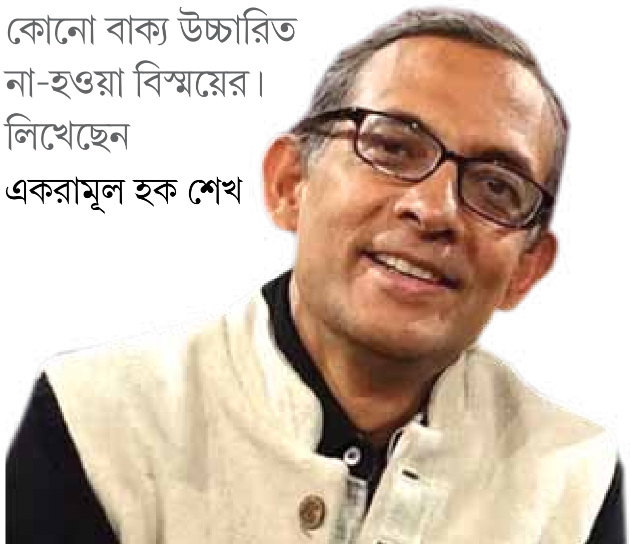

দারিদ্র্যের উৎস সন্ধানে

১৯ পাতায়

অন্যান্য বিভাগ

পাঠকনামা	০৪
সম্পাদকীয়	০৫
বঙ্গদর্শন	৩৫
মুক্তভাষ	৩৯
বিশ্ববিচিত্রা	৪২
সাত-পাঁচ	৪৬
মিশন সমাচার	৫২

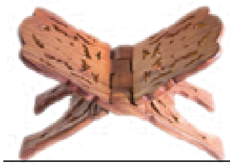

মাটিতে দর্পভরে পা ফেলো না। তুমি মাটিও ফাটাতে পারবে না, আর পাহাড়ের সমান উঁচুও হতে পারবে না।

— আল-কোরআন, সুরা বনি-ইসরাইল, আয়াত ৩৭

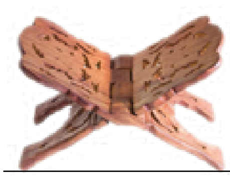

আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন— 'যে-ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে বিদ্যা অর্জন করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।'

— সহিহ্ মুসলিম, হাদিস সংখ্যা ২৬৯৯

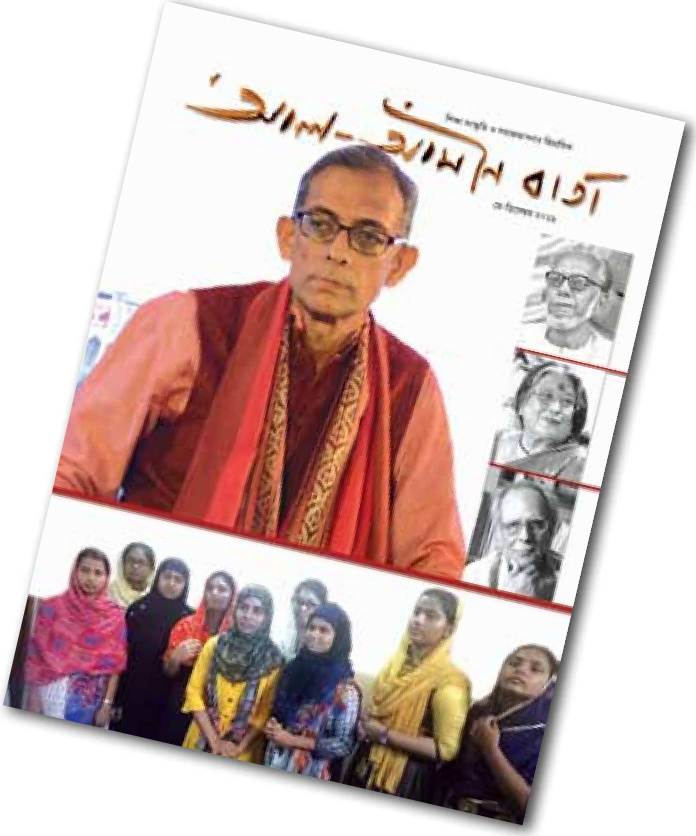

মরমি গল্পকার আবদুর রাকিব

‘আল-আমীন বার্তা’ (মে-ডিসেম্বর ২০১৯) একটু দেরিতেই পেলাম। কিন্তু ‘সবুরে মেওয়া ফলে’ বয়ে এনেছে এই সংখ্যা। চতুর্থ বাঙালির নোবেল জয়ের সঙ্গে তিন বরেণ্য সাহিত্যিকের চিরবিদায়ে হর্ষ ও বিষাদের যুগপৎ সমাহার ঘটেছে। মরমি গল্পকার আবদুর রাকিব কলকাতাকেন্দ্রিক শহুরে পাঠকের কাছে ততটা পরিচিত না হলেও, বাংলা সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর গল্পের নিয়মিত প্রকাশ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। গ্রামীণ আটপৌরে মুসলমান সমাজের যাপিত জীবনের নানা বাস্তবতা তাঁর প্রতিভায় সুখপাঠ্য মোড়কে অনির্বচনীয় ভাষায় আমাদের প্রাণিত ও তৃপ্ত করে। তাঁর গল্পে দেশি-বিদেশি সাহিত্যের নানা তত্ত্ব ও ইজমের গুরুগম্ভীর প্রয়োগ নেই বললেই চলে। গল্পগুলি অনেকটাই নিপাট সাদা, সরল। জীবনের জটিলতাকে তিনি দেখেছেন শিক্ষক হিসেবে, পথের পাশের পসারি হিসেবে। সেসব অভিজ্ঞতাকে অনুপম ভাষায় জারিত করে পাঠকের দরবারে পেশ করেছেন। তাঁর গল্পের পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন তিনি জীবনের যাবতীয় নীচ-কদর্য-পাশবিকতায় সম্পৃক্ত পাত্রপাত্রীকে পরম আদর ও যত্নে স্বাভাবিক মানবিক গুণসম্পন্ন হিসেবে তুলে ধরতে দক্ষ শিল্পীর ভূমিকা পালন করেছেন। নিবন্ধকার আবু রাইহান রচিত শ্রদ্ধার্ঘ্যেও গল্পকারের স্বীকারোক্তিতেও সেটির প্রতিধ্বনি “অজস্র মন্দের মধ্যে কোথাও-না-কোথাও একটু ভালো থাকে! সেটুকু খুঁজে পেতে তুলে ধরি বলে পাঠকের এমন মনে হয়। মানে, বাস্তবে যা নেই, থাকলে ভালো হয়। এমন সম্ভাবনার কথা বলি বা লিখি বলে হয়তো পাঠক তার নির্যাসটুকু পান।” দুর্ভাগ্যই বলি আর বিধিলিপিই বলি, বাংলা জনপদের কিনারায় ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা অসম্ভব প্রতিভাবান গ্রামীণ সাহিত্যসাধকদের জন্য কলকাতার শহুরে সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিসর বেশ সংকীর্ণ ও অনুদার। ‘চারণকবি গুমানী দেওয়ান’ ও ‘সংগ্রামী নায়ক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ’ প্রমুখ জীবনীগ্রন্থ ছাড়া সমালোচকদের মতে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ‘পথ পসারীর পত্রোত্তর’। প্রান্তিক মুসলমান সমাজের তরুণতরুণী সৃজনশীল সাহিত্যের অঙ্গনে ঘরে বাইরে যে-ধরনের বিড়ম্বনা ও দহনের সম্মুখীন হয়ে থাকে, সেসবের আত্ম-অন্বেষণের রুচিশীল সাহিত্যিক উচ্চারণে ভরা এই গ্রন্থ। আমরা এই গ্রন্থেই পাই গল্পকারের বেদনাবিধুর এক ঋদ্ধ উচ্চারণ, “আমাদের বাঙালিত্ব সবাই চান, কিন্তু কেউই চান না মুসলমানত্ব।”

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি এক সুখস্মৃতির কথা। প্রায় এক দশক আগে সৌভাগ্যক্রমে আবদুর রাকিব আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে হার্দ্য কথোপকথনে শিক্ষা, মানবিকতা ও মনীষার আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছিল সে-দিন। তিনি এখন চিরপ্রস্থানে চিরঘুমে, কিন্তু চিরঅম্লান তাঁর স্বর্ণালি স্মৃতিময় পদার্পণ, যেটি আমাদের পরম প্রাপ্তি।

আলাউদ্দিন মল্লিক, প্রধান শিক্ষক, বিজয়রামচক কিশলয় নার্সারি স্কুল, পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অনন্য পরম্পরা

প্রখ্যাত বিপ্লবী ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) চল্লিশের দশকে জেলে থাকাকালে রচনা করেছিলেন ‘The Historical Role of Islam’, যেটির বাংলা অনুবাদ ‘ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান’। সাধারণ পাঠক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায়, উভয়ের কাছে গ্রন্থটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। ‘The Historical Role of Islam’ ১৯৩৬ সনে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত এবং বাংলায় সেটি ১৯৪৮-এ প্রথম অনূদিত হয়। তিনি ইসলামের সমৃদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে বৌদ্ধিক সেতুবন্ধনের সূচনা করেন।

এম এন রায়ের গ্রন্থ প্রকাশের আট দশক পর প্রকাশিত হল সুমিতা দাসের পরিপূরক গ্রন্থ ‘অন্য এক রেনেসাঁস: আরবি-ইসলামীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ’। উভয় বাংলায় এ-ধরনের ব্যতিক্রমী গ্রন্থ সম্ভবত প্রথম। কারণ, আরব মনীষার অতুলনীয় অবদান নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আলোচনা করেছেন লেখিকা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক অনুরাধা রায় গ্রন্থটি নিয়ে লিখেছেন, “অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত (কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও পরে) মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, স্পেনজুড়ে যে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল— মুসলমান শাসকদের আওতায়, অনেকটা ইসলাম-ধর্মীয় মানুষদের হাতে, যদিও সেখানে অন্য ধর্মের মানুষদের, যেমন ইহুদি, খ্রিস্টান ও জরাথুস্টীয় পারসিকদেরও অংশগ্রহণ ছিল, এবং যে সভ্যতার লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ছিল আরবি (সরকারি কাজকর্মের ভাষা ও কোরানের ভাষা হিসেবে মান্যতা পেয়ে)— সুমিতার বইটি তা নিয়েই।”

তবে আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত মিলন দত্তের ‘বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অনন্য পরম্পরা’ পড়ে মন ভরে গেল। সুমিতা দাসের গ্রন্থটি যে-সুরে রচিত, মিলন দত্তের আলোচনাতেও সেই একই স্বরধ্বনি উচ্চারিত। তিনি যথার্থই লিখেছেন, “ইসলামের ওই সোনালি দিনের না-জানা কথা মনে করিয়েছেন সুমিতা দাস তাঁর ‘অন্য এক রেনেসাঁস: আরবি-ইসলামীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ’ বইয়ে। এমন একটা ইতিহাস কোনো শিক্ষিত মানুষের না-জানার কথা নয়। তাহলে আমরা জানি না কেন? কারণ, আমাদের পাঠ্য ইতিহাসের বইয়ে মুসলমানের এইসব উজ্জ্বল সময়ের কথা থাকে না। সাতকাহন করে লেখা থাকে তথাকথিত যুদ্ধবাজ হানাদার আর দখলদার মুসলমান সুলতানদের কথা।”

এই পরিপ্রেক্ষিতে দুটো অনুরোধ করি। গ্রন্থালোচনার ‘বইভব’ বিভাগকে আলাদা করে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সূচিপত্রেও সেটির উল্লেখ করা। এবং পত্রিকার প্রথম দিকে ‘সেই সময়’ বিভাগে আরব মনীষীদের নিয়ে আলোচনায় ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠক সকলেই সমৃদ্ধ হতেন। সেই বিভাগটি পুনরায় চালু করা হোক!

অনিন্দিতা দাস, বলরামপুর, পুরুলিয়া।

এক ভয়ংকর সময়ের ঘূর্ণিচক্রে আমরা সবাই এখন আবর্তিত হচ্ছি। কোভিড-১৯ জীবাণু আমাদের দেশেরই শুধু নয়, সারাপৃথিবীর মানুষকে অতিমারীর খাদে ঠেলে দিয়েছে। কবে যে এই অতল খাদ থেকে আমরা উঠতে পারব, কেউ জানি না। বিশ্ব জুড়ে লক্ষ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে আমরা হারিয়েছি আমাদের অনেক নিকটজনকে। হারানোর এই বেদনাবোধ সহজে যাবার নয়।

করোনার থাবা ছিনিয়ে নিয়েছে অনেক বিখ্যাতজনেরও প্রাণ। যেমন বাংলাদেশের শুধু নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির অগ্রগণ্য ব্যক্তি আনিসুজ্জামানকে কেড়ে নিয়েছে করোনা। এপারে, কলকাতা শহরে তাঁর জন্ম। আর ওপারে মানুষের প্রকৃত মুক্তির কামনায় কেটেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত এই মানুষটির জীবন। করোনাকালেই আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন বাংলাভাষার ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক দেবেশ রায়। নতুন ভাষা, নতুন ভঙ্গি আর নতুন মানুষের সন্ধানে তিনি ছিলেন সদাসৃষ্টিশীল। গত বছরের ডিসেম্বরে প্রয়াত হন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সুরজিৎ দাশগুপ্ত, যিনি ছিলেন আল-আমীন মিশনের পরম সুহৃদ। এঁদের স্মরণ করার অর্থ নিজের জাতিকে স্মরণ করা। এই সংখ্যায় তিন বিশিষ্ট মানুষকে নিয়ে তাই আমাদের ক্ষুদ্র নিবেদনস্বরূপ রইল তিনটি লেখা।

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের গর্ব। তাঁর নোবেল-প্রাপ্তির উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমাদের গত সংখ্যাটি ছিল বিশেষ সংখ্যা। এ-বার রইল অনালোচিত বিষয়ে একটি রচনা। দারিদ্র্য দূরীকরণে যে-প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সহযোগীরা দুনিয়া জুড়ে গবেষণা করছেন, সেই আব্দুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব-এর বিষয়টি বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে এই লেখায়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ এখন প্রায়-বিচ্ছিন্ন। তবু, এমন দুঃসময়েও নিয়মিত বিভাগগুলো সাধ্যমতো সংযোজনের চেষ্টা আমরা করেছি।

করোনা অতিক্রম করে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে হয়তো আরও কিছু সময় লাগবে। আমাদের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে এই আপৎকালীন সময়টুকু সমস্ত রকমের সাবধানতা অবলম্বন করে চলা এবং সুদিনের আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা। আমরা জানি পরম করুণাময় ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। আশা করছি শিগ্‌গিরই আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারব ইনশাআল্লাহ্‌।

উপন্যাস লিখতে বসে লেখক কাহিনি খুঁজে বেড়ান, দেবেশ রায় প্রকৃতির কথা খুঁজে নিয়ে আসতেন। বলতেন, আমাদের দেশে মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ও প্রস্থানের সঙ্গে মানুষের জীবন যেভাবে অন্বিত, তা নিয়েও উপন্যাস লেখা যাবে না কেন? সাহিত্যের ভূমণ্ডলে এমন ব্যতিক্রমী লেখকদেরই যুগে যুগে অগ্রপথিকরূপে বরণ করা হয়েছে। এই স্মরণলেখায় সেই দেবেশ রায়ের প্রতি রইল শ্রদ্ধা।

দেবেশ রায়
মানচিত্রের বাইরে থাকা লেখক

অমর মিত্র

দেবেশ রায়ের একটি গল্পের বই বেরিয়েছিল সারস্বত লাইব্রেরি থেকে। সেই আটষট্টি-উনসত্তরের কথা। এলা রঙের ওপর লাল একটি অঙ্কন, এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তখন অন্যরকম যাঁরা লিখতে চান, দেবেশ রায় ছিলেন তাঁদের অতি আগ্রহের লেখক। তিনি থাকতেন জলপাইগুড়িতে। কখনো কলকাতায় এলে তরুণ অতি তরুণ লেখকদের কাছে তা ছিল খবর। দেবেশ রায়ের সেই বইটির নাম 'দেবেশ রায়ের গল্প'। সেখানে ছিল 'দুপুর', 'নিরস্ত্রীকরণ কেন', 'কলকাতা ও গোপাল', 'আহ্নিকগতি' ও 'মাঝখানের দরজা' এইসব আলাদা গল্প। মনে পড়ে ওই গল্পের কথা, যা প্রচলিত গল্পের বাইরে থেকে দেখা। 'দুপুর' গল্প তো এখন মিথ হয়ে গেছে। তারও পরে 'জলধর ব্যানার্জীর মৃত্যু', 'উদ্বাস্তু', 'পা', 'হাড়কাটা', 'যৌবনবেলা', 'মানচিত্রে নেই' কত গল্প। লিখতে এসেছি যখন, দেবেশ রায়কে পড়তে

বলেছিলেন এক অগ্রজ। কমলকুমার মজুমদার এবং 'অন্তর্জলী যাত্রা'র কথা জেনেছিলাম 'দেশ' পত্রিকায় 'সনাতন পাঠকের কলম' পড়ে। তখন গ্র্যাজুয়েট বেকারের টিউশননির্ভর জীবন। এক দুপুরে কলেজ স্ট্রিট গিয়ে খুঁজে খুঁজে 'দেবেশ রায়ের গল্প', কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' কিনে এনেছিলাম।

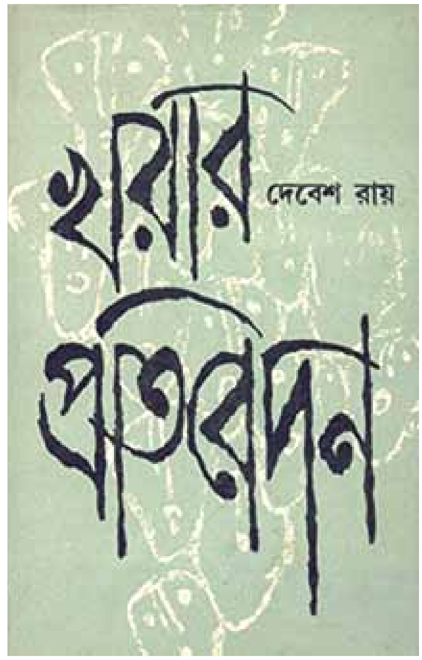

দেবেশ রায়কে প্রথম দেখি ১৯৭৫ সালে। 'পরিচয়' অফিসে। সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে বসে আছেন। সময়টি জুন হবে। ঠিক মনে নেই। তিনি তখন জলপাইগুড়িতে থাকেন। নিজের শহরের আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করেন। কলকাতায় এলে আমাদের চেনা অগ্রজদের ভিতর সাড়া পড়ে যায়। তাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। তিনি তাঁদের কাউকে কাউকে বলেন, "আপনাদের গল্প পড়লে মনে হয় মাঝখানে কয়েকটি পাতা নেই।" তাঁরা অবাক হয়ে নিজেদের ভিতর আলোচনা করেন, ভাবেন দেবেশ রায় কী কথা বলে জলপাইগুড়ি চলে গেলেন। আমি 'পরিচয়'-এ প্রবেশ করলে, দীপেনদা বললেন, "দেবেশ, এই ছেলেটির নাম ...।" আমি বিস্ময়ে দেখছি তাঁকে। একটু গুটিয়ে গেছি। আমি বোধ হয় তিন মাস আগে 'পরিচয়'-এ প্রথম গল্প 'শকুন্তলার জন্ম' লিখেছি। ক-টা পাতা নেই তার ভিতরে? ভয় করছিল। তিনি স্নেহমিশ্রিত মুখে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেন, বললেন, "বোসো, তোমার গল্প পড়েছি, দীপেন যখন ছেপেছে ...।"

তখন আমি 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছি' পড়েছি। পড়েছি 'গল্প কবিতা' পত্রিকায় 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে'। গল্পের বই তো আগেই পড়া। 'যযাতি' পড়েছি। পরের বছর পড়ব 'মানুষ খুন করে কেন'। উত্তরবঙ্গ, চা-বাগান, মানুষের লোভ, পাপ নিয়ে ছিল সেই মহাউপন্যাস। তারপর থেকে তাঁকে পড়ছি। মিশেছি অনেক। মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। তিনি শিক্ষকের মতো। তাঁর গদ্য প্রথমে থমকে দেয়। প্রবেশ করলে তা অতি উচ্চাঙ্গের সংগীত। কবিতা। তার চিহ্ন 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' থেকে গত কয়েক বছরে লেখা 'টৌন জল্পেশগুড়ি যে শহরে দু-দিক থেকে সূর্য ওঠে', 'দূরতর জন্মভূমি', ইউসুফ ও জুলেখার পুরাণকথা নিয়ে উপন্যাসেও রয়েছে। ছিল 'দুপুর'-এও। গ্রীষ্মের সেই দুপুরে বাতাসে ভেসে আসা বেহালার সুর এখনও কানে আসে। মনে পড়ে 'নিরস্ত্রীকরণ কেন' গল্পে মধ্যরাতে চলন্ত ট্রেনের দরজার বাইরে অবিরাম করাঘাত। কেউ উঠতে চায় ভিতরে। স্টেশনেও দরজা খোলেনি। এইসব গল্প আমাদের প্রচলিত গল্পের থেকে আলাদা। মানচিত্রের বাইরে।

আমাদের সাহিত্যচর্চা এক খাতেই বয়ে যায়। পূর্বসূরী থেকে উত্তরসূরী। একজনের ধারা বহন করে চলেন আর-একজন। এই যেমন উনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারা বহন করেন, উনি মানিক কিংবা বিভূতি। কেউ সতীনাথ ভাদুড়ীকে সিদ্ধগুরু-জ্ঞানে সম্মুখে রাখেন। বলেন তাই-ই হবে আমাদের উপন্যাসের চলন। গল্প লিখতে কেউ বিমল করকে করেন অনুসরণ। দেবেশদার কোনো পূর্বসূরী ছিলেন না, তাঁর কোনো উত্তরসূরী হবে বলে জানি না। তিনি জীবনভর উপন্যাসের খোঁজেই থেকেছেন। ইয়োরোপীয় মডেল, কাহিনি বয়ন সব পরিত্যাগ করে নিজের পথ খুঁজে বের করেছেন। তার ভিতরে আমি রুশ উপন্যাসের মহাকাব্যিকতার ছোঁয়া পাই। দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাসে একক। উপন্যাস লিখতে বসে লেখক কাহিনি খুঁজে বেড়ান, দেবেশ রায় প্রকৃতির কথা খুঁজে নিয়ে আসেন। বলেন, আমাদের দেশে মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ এবং প্রস্থানের সঙ্গে মানুষের জীবন যেভাবে অন্বিত, তা নিয়েও উপন্যাস লেখা যাবে না কেন? আসলে তিনি লিখনের যে-মানচিত্র আছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেমন প্রত্যাখ্যান করেছিল তিস্তাপারের বাঘারু এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে। হেঁটেছিল গভীর অরণ্যের আরও গভীর পথে। দেবেশ রায়ও তাঁর প্রত্যাখ্যানের ভাষায় ছিলেন ধারাবাহিক। নাহলে কী করে রাষ্ট্র শুরু করে গেরিলা যুদ্ধ এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে, যা কিনা বিপরীতভাবেই দেখতে অভ্যস্ত আমরা। তাঁর উপন্যাসের যাত্রা উপন্যাসের স্বাভাবিক বহমানতার বিপরীতে। তাই তিনি আমার লেখক। রুশ উপন্যাস এবং দেবেশ পড়ে, তাঁর কথা শুনে আমার উপন্যাসযাত্রা। তিনিই শেখাতে পারতেন। আড্ডা দিতে দিতে শেখা হত।

দেবেশ রায় কয়েক বছর আগে দু-টি শারদীয় পত্রিকায় একই চরিত্র নিয়ে গল্প লিখেছিলেন। আর লেখেননি। মনে হয়েছিল এই বুঝি শুরু হল আর-এক উপন্যাস, যা কিনা স্বাভাবিক আখ্যানের বিপ্রতীপ এক আখ্যান। ভেবেছিলাম এইগুলি জুড়ে জুড়ে একটি নতুন উপন্যাস— আখ্যান হতে

দেবেশ রায়ের একটি গল্পের বই বেরিয়েছিল সারস্বত লাইব্রেরি থেকে। সেই আটষট্টি-উনসত্তরের কথা। এলা রঙের ওপর লাল একটি অঙ্কন, এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তখন অন্যরকম যাঁরা লিখতে চান, দেবেশ রায় ছিলেন তাঁদের অতি আগ্রহের লেখক। তিনি থাকতেন জলপাইগুড়িতে। কখনো কলকাতায় এলে তরুণ অতি তরুণ লেখকদের কাছে তা ছিল খবর।

দেবেশদার কোনো পূর্বসূরী ছিলেন না, তাঁর কোনো উত্তরসূরী হবে বলে জানি না। তিনি জীবনভর উপন্যাসের খোঁজেই থেকেছেন। ইয়োরোপীয় মডেল, কাহিনি-বয়ন সব পরিত্যাগ করে নিজের পথ খুঁজে বের করেছেন।

পারে। বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন কীভাবে বদলে যাচ্ছে, সেই কথা তিনি বলতে শুরু করলেন 'ঘুমের ভিতরে হাইওয়ে' এবং 'সি সি টিভির ভিতর দিয়ে' দুই গল্প দিয়ে। নয়নের স্বামী অনীশ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে কাজ করে, তার ফেরা হয় তখনই যখন কলকাতা থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে গিয়ে পড়ে ট্রাকগুলি। তারপর ভারতবর্ষের দিকে চলতে থাকে। সেই হাইওয়ে যুবক স্বামী অনীশকে রাত সাড়ে এগারো, পৌনে বারোটায় বাড়ি ফেরার পরেও তাড়িত করে। তারা একটি আবাসনে ভাড়া থাকে। স্ত্রী নয়ন দুপুরে এক কোম্পানির সেলস এক্সিকিউটিভের কাজ করে। এমনই এক কোম্পানি, যাদের কোনো শো-রুম নেই, যারা চাকরি দেয় না, ডেজিগনেশন দেয়। মাইনে দেয় না, মাইনে তাকেই সংগ্রহ করে নিতে হয়। একটি অফিস আছে মাত্র সেক্টর ফাইভে। জিনিস বেচে, অথচ তাদের দোকান নেই। পুরোটাই যেন ভারচুয়াল জগতের ব্যাপার। সেই কোম্পানিই যখন মিটিং ডাকে রাত সাড়ে আটটায়, তখন নয়নের পরিবার, সন্তান নিয়ে হয় সংকট। অনীশের ফেরা যাবে না কলকাতা থেকে ট্রাক বেরিয়ে হাইওয়েতে না ওঠা পর্যন্ত। আবাসনের ফ্ল্যাটে একা থাকবে তাদের সন্তান মম ...। দেবেশ রায় বদলে যাওয়া শহর আর মধ্যবিত্তকে ধরতে চেয়েছেন। আশিতে পৌঁছে। তাঁর ওই দেখা ছিল মানচিত্রের বাইরে গিয়ে দেখা।

তাঁর একটি অচেনা গল্প 'মানচিত্রের বাইরে' নিয়ে কথা বলছি। এই গল্প কোনো এক খবরের কাগজের কলম লিখিয়ে পরমহংস ও ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার বিনয়ের। আবার এই গল্পে জড়িয়ে আছে পরমহংসের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়া তার স্ত্রী অনু আর কন্যা বাবিও। কোনো এক দোসরা শ্রাবণের জন্য অপেক্ষা করছিল পরমহংস। সে-দিন সে অনুর কাছে যাবে। অনুর জন্মদিনের উইস করতে। এই গল্প সেই দোসরা শ্রাবণের। সেই দিনের বিকেলটিকে পরমহংস খোলা রাখতে চায়। তার কাগজের নিউজ এডিটর পরদিন থেকে একটি লেখা ছাপতে যাচ্ছেন, 'ক্যালকাটাজ ইজি ডেথ'— 'কলকাতার সহজ মৃত্যু' এই শিরোনামে। লেখা দেওয়া হয়ে গেছে পরমহংসের। বিনয় দেবে ছবি। বিনয় যদি বিকেলের মধ্যে না আসে, আর ছবি যদি সন্ধ্যের ভিতরে ঠিক না করে নিতে পারে পরমহংসের যাওয়া হবে না গলফ লিঙ্ক। বিচ্ছেদের পর অনুর সঙ্গে বা মেয়ে বাবির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। বাবি একটি চিঠি তাকে দিয়েছিল, কিন্তু সেই চিঠির ভিতরে বাবির সম্বোধনে ছিল আড়ষ্টতা। পরমহংস টের পাচ্ছে এক নিষ্পত্তিহীন যৌনতা তাকে প্রবল টানছে। তার কোনো তৃপ্তি অন্যত্র নেই। এমনকী অনুতেও নেই। কিন্তু যৌনতার টান রয়েছে প্রবল। সকাল দশটায় জানালা দিয়ে দেখা পাশের বাড়ির দেয়াল, জানালায় নিমের ছায়ার দোলায় সেই যৌনতা মিশে যায়। মানিকতলা মোড়ে হঠাৎ বৃষ্টি ঝেঁপে আসার ভিতরে, রাস্তার আকস্মিক জনহীনতার ভিতরে ... পরমহংসের দিনযাপনের ভিতরে, দোতলা বাসের ওপর থেকে দেখা শহর, এয়ারপোর্টের ভি আই পি লাউঞ্জে, দুর্গাপুর ব্রিজের মাঝখান থেকে দেখা পশ্চিমমুখো রেললাইনগুলোর ধাবমান প্রান্তরে বয়ে যায় অনুর শরীরের শানিত ইস্পাত। দেবেশ রায় লিখছেন, "এই শহর কলকাতার অনুপ্রাসহীন সীমান্তহীন কলকাতার নাগরিক বিস্তার জুড়ে অনুর শরীর নিয়ত অন্বিত হয়ে থাকে পরমহংসের কাছে যৌনের আসঙ্গো।" ওই যৌনতাই তাকে টানছে অনুর কাছে। টানছে অনেক দিন, কিন্তু সে এড়িয়ে থাকতে পেরেছে দোসরা শ্রাবণকে সামনে রেখে। যে-স্ত্রীর সঙ্গো সম্পর্ক ছেদ হয়ে গেছে, সেই স্ত্রীর প্রতি টান বোধ করার কোনো আইনি অধিকার, সামাজিক অধিকার তার নেই। গল্পের চালচিত্র এই। আর গল্প হয় বিনয়ের ছবি আর তার নির্বাচন নিয়ে। পরমহংসের দ্বিধা আছে গলফ লিঙ্ক যাওয়ায়। তাই সে অনুর জন্মদিন এই দোসরা শ্রাবণ পর্যন্ত তা পিছিয়ে রেখেছিল। আজ বিনয় কখন ছবি দেবে, তার ওপর নির্ভর করছে তার যাওয়া। বিনয় কত ছবি নিয়ে বসে আছে তার নিজের ঘরে। পরমহংস যায় দুপুরে সেখানে। ফিরেও আসে। হাওড়া ব্রিজের একটা গর্ত থেকে আচমকা গলে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক পথচারীর। তা নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। তারপর এই শহরে যে যে

সহজ মৃত্যুর বিষয় আছে, উপায় আছে, সেই কাহিনি বেরোবে পরমহংসের পত্রিকায়। বিনয়ের সঙ্গে পরমহংস ছবির কথা বলতে থাকে। ঘেস চুরি করতে গিয়ে ঘেসের গুহার ভিতরে শিশুর মৃত্যু, রাস্তায় ঘুমন্ত পথচারীর ওপর মাতাল লরি, গঙ্গার তীরে শত বছরের পুরোনো বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত্যু সেখানে আশ্রয় নেওয়া মানুষের। সেই ছবি নেওয়া হয়েছিল গঙ্গার ভিতর থেকে। মৃত্যুর খবরও সাজিয়ে পরিবেশন করতে হয়। তারা মৃত্যু নিয়েই কথা বলে যায়। গল্পের ভিতরে চলে আসে ঘেসের গুহার ভিতরে ঢুকে শিশুমৃত্যু। খোলা হাইড্রান্টে পড়ে শিশুমৃত্যু কমন, কিন্তু ক্রমাগত গর্ত খুঁড়ে ঘেসের ভিতরে ঢুকে গিয়ে পনেরো-বিশটি বাচ্চার মৃত্যু স্টোরি হিসেবে অভিনব নিশ্চয়। আসলে এই গল্প মৃত্যুর গল্প। সহজ মৃত্যু সবসময় রহস্যময়। ঘেস দিয়েই এই মৃত্যুর কাহিনি খবরের কাগজে শুরু হবে। কলকাতার সব হাউজিং প্রজেক্টই ঘেস দিয়ে ভরাট করা জমিতে মাথা তোলা। ঘেস আসলে কবরখানা। 'ক্যালকাটা ইজ গোয়িং হাই অন গ্রেভস— ', আসলে মৃত্যুর কথাই বলতে বসেছেন দেবেশ রায়। সহজ মৃত্যু। এই যে সময় যায়, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যায়, গলফ লিঙ্ক যাওয়ার সময় পেরিয়ে যায়। পেরিয়ে যাওয়া মানে আবার কোনো এক চৈত্র বা ফাল্গুনের জন্য অপেক্ষা করা। পরমহংসের কাছে বিনয় শুনতে চায় মৃত্যুর এক ধারাবিবরণ। পরমহংস তা শোনাতে আপত্তি করেনি। শোনাতে শোনাতে সে বোঝে অনু দূরে সরে যাচ্ছে। বিনয় তার কোলে ফেলে দিয়েছে অনেক মরা মানুষের ছবি। পরমহংস ঘাড় নামিয়ে দেখে, থালাভরা জলে যেমন গ্রহণের সূর্য দেখে— মৃতদেহ-ভাসা স্রোতে আরও যুগ-যুগান্তরের পারে চলে যাচ্ছে দোসরা শ্রাবণ। আসলে একটি সম্পর্কের সহজ মৃত্যুর গল্প বললেন দেবেশ। পড়তে পড়তে কি মনে হয় না, শুনতে পাচ্ছি দূরাগত ক্রন্দনধ্বনি। একটি শোকগাথা। এপিটাফ।

আসলে তিনি লিখনের যে-মানচিত্র আছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেমন প্রত্যাখ্যান করেছিল তিস্তাপারের বাঘারু এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে। হেঁটেছিল গভীর অরণ্যের আরও গভীর পথে।

আমি দেবেশদাকে নিয়ে এক শোকগাথা রচনার চেষ্টাই করছি। সেই যে মৃত্যুসংবাদ এল গভীর রাতে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রাতে, আতঙ্ক ঘিরে ধরল কান্নার সঙ্গে। তাহলে কি সেই ভাইরাস তাঁকে কেড়ে নিল? সারাটা দিন ধরে ভয়ে ভয়ে থেকেছি, ঘরের ভিতরে সে ঢুকল কীভাবে? লোহার বাসরঘর, সাঁতালি পর্বত, ছিদ্রটি ছিল কোথায়? তাহলে কেউ নিরাপদ নন? আমি ঘরে রয়েছি, আমাকেও খেয়ে নিতে পারে কোভিড-১৯? অপেক্ষা আর অপেক্ষা। চিকিৎসকবন্ধুদের ফোন করে জানতে চেয়েছিলাম শ্বাসকষ্ট কেন? ভাইরাসটি ফুসফুসে গিয়ে বাসা বাঁধে। ২০ ঘণ্টা বাদে, ১৫ মে সন্ধ্যার পর প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী জানালেন, না তা নয়। কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ। যাক, নিশ্চিন্ত। আমরা এখন মরণ আর জীবনের সীমানাটুকু কমিয়ে ফেলেছি ক্রমাগত মৃত্যুর বিবরণ পাঠ করতে করতে। কিন্তু সেইসব বিবরণ ছিল নেহাতই সংবাদ। জলের ওপর তার ছায়া দেখে অনুমিত মৃত্যুর আখ্যান নয়। গ্রহণের কালে সূর্যকে যেভাবে দেখা হয়। দেবেশদাই পারতেন এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে। তাঁর মৃত্যুর বিবরণ তিনিই লিখে উঠতে পারতেন। কিন্তু মৃত্যু সেই সুযোগ দেয় না। এখানেই মৃত্যুর কাছে মানুষের পরাজয়। ৩ বা ৪ এপ্রিল তিনি তাঁর ভয়ের কথা বলেছিলেন মোবাইল ফোনে— "অমর, আমার খুব ভয় করছে।" সেই ভয় কাটাতে কত কথাই-না বলেছিলাম, তিনি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার অনুমানের হেতু কী? কথাগুলি বিশ্বাস করেননি। কত অন্ধকারে তিস্তাদেশ ঘুরে, কত বিপর্যয় পার হয়ে এতটা জীবনে পৌঁছে, তিনি কী করে স্তোকবাক্যে ভোলেন?

দেবেশদাই পারতেন এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে। তাঁর মৃত্যুর বিবরণ তিনিই লিখে উঠতে পারতেন। কিন্তু মৃত্যু সেই সুযোগ দেয় না। এখানেই মৃত্যুর কাছে মানুষের পরাজয়।

দেবেশদা: দেখলে তো ভয় অমূলক ছিল না।

কোভিড-১৯ তো আপনাকে ছোঁয়নি দেবেশদা।

তাই-ই হয়েছে, কোভিড না এলে অমিয়ার মুখটি দেখতে পেতাম, চলে গেল, আর ভালো লাগে, কোভিড এসে সব ভেঙেচুরে দিয়ে গেল?

বললাম, "দেবেশদা, একবার বলেছিলাম, গল্পে এত ডিটেলিং কেন? আপনি বললেন, গল্পে আমি কী চাই? চুপ করে গিয়েছিলাম। পরে বুঝলাম এই বিপরীত যাত্রাই আপনার যাত্রা।"

দেবেশদা: কী যে বলো, আমার লেখার কথা বাদ দাও।

বললাম, "ভুলা মাসানের পাকে, ধানখেতের ভিতরে চ্যারকেটু হারিয়ে গেছে, আমি অমনি ধান খেত দেখেছি মেদিনীপুরে, মফস্সলি বৃত্তান্তের অংশ হয়েছিল তা।"

দেবেশদা বললেন, "এসব মনে আছে?"

সবই মনে আছে দেবেশদা। মনে থাকবে বাকি জীবন। ■

শিক্ষা আর সংস্কৃতিজগতের মানুষ হয়ে তাঁর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি বাংলাদেশে আর-কেউ পাননি। বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিরল গুণসম্পন্ন এই মানুষটির মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হল বাংলাদেশের একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের। এই লেখায় কলকাতার এই জাতককে আমাদের ক্ষুদ্র শ্রদ্ধা-স্মরণ।

আনিসুজ্জামান
একটি সাংস্কৃতিক অধ্যায়ের সমাপ্তি

একরাম আলি

এই করোনাকালে কোভিদ-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। গত ১৪ মে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে। ৮৩ বছর বয়সে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের জন্ম ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে, কলকাতায় হলেও পৈতৃক বাসস্থান অখণ্ড চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার মোহাম্মদপুর গ্রামে। ১৯৩৬ সালে তাঁদের পরিবার বসিরহাট ছেড়ে চলে আসে কলকাতায়, এন্টালির কাছে ৩১ ক্যান্টোফার লেনের এক ভাড়াবাড়িতে। সেই বাড়িতেই ১৯৩৭-এ আনিসুজ্জামানের জন্ম। পুরো নাম আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। পিতা এ টি এম মোয়াজ্জেম ছিলেন খ্যাতনামা হোমিয়ো-চিকিৎসক। মা সৈয়দা খাতুন। মূলত গৃহবধূ হলেও ছিলেন সাহিত্যরসিক। তাঁর নামে 'হাতেম তাই'-এর একটি বাংলা অনুবাদগ্রন্থ পাওয়া যায়। আনিসুজ্জামানের পিতামহ শেখ আব্দুর রহিম কোরআনের বাংলা অনুবাদক। তবে তাঁর খ্যাতি ছিল সাপ্তাহিক 'মিহির' ও মাসিক 'সুধাকর' নামে দুটি পত্রিকার সম্পাদনায়। আনিসুজ্জামান ছিলেন পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান। বড়োদিদি তৈয়বুন্নেসার কবিতা ছাপা হত 'সওগাত',

'গুলবাগিচা'র মতো পত্রিকায়। সুতরাং জন্মাবধি সাহিত্য-সংস্কৃতির জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে আনিসুজ্জামান ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠেন।

কলকাতায় কয়েক বার বাড়ি বদল করতে হয় পরিবারটিকে। ৭/এ নম্বর কংগ্রেস একজিবিশন রোডের বাড়িতে থাকাকালীন ১৯৪৩ সালে সাত বছর বয়সে তাঁকে ভর্তি করা হয় পার্কসার্কাসের একটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে। এখানে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপরই এল ১৯৪৭ সাল। ধর্মের ভিত্তিতে হল দেশভাগ। মোয়াজ্জেম কী করবেন, দ্বিধায় ছিলেন। শেষপর্যন্ত স্ত্রীর পরামর্শে কলকাতা ছেড়ে পূর্ববঙ্গো যাবার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে ওঠেন খুলনায়, সেখান থেকে ঢাকা। ঢাকায় তাঁকে ভর্তি করা হল প্রিয়নাথ হাই স্কুলে। ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিকুলেশনে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে পাশ করেন। ১৯৫৩ সালে আই.এ. পাশ করেন জগন্নাথ কলেজ থেকে। পরে বি.এ. ও এম.এ. পড়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। দুটিতেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম।

বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গো সঙ্গো আনিসুজ্জামানের নানা চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটছিল দ্রুত। যখন ১৯৪৬-এর অগাস্টের মাঝামাঝি কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়, তখন থেকে কিশোর আনিস প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের একটা নেতিবাচক দিক দেখতে পান। ১৯৪৭-এ দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যাপারটার রাজনৈতিক গুরুত্ব না বুঝলেও দেশভাগ ও সেইসূত্রে দেশত্যাগের যে-হিড়িক শুরু হয়েছিল, বছর দশেকের একটি বালকের মনে তার স্থায়ী ছাপ পড়ে। তাঁদের পরিবারটি লিগের দাবির পক্ষে ছিল। তাই কলকাতায় হয়তো উৎপীড়নের ভয় ছিল। তার আঁচ এসে লেগেছিল ছোট্ট আনিসের মনেও। পূর্ব পাকিস্তানে থিতু হওয়ার পর এই উৎকণ্ঠা আর ভীতিবোধ কাটে বটে, কিন্তু সে-দেশে ততদিনে রাষ্ট্রভাষাকে ভিত্তি করে শুরু হয় আন্দোলন। ১৯৪৮-এ পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পাশাপাশি ৭০ শতাংশ দেশবাসীর মাতৃভাষা বাংলার দাবি ওঠে।

আন্দোলন তুঙ্গো পৌঁছোয় ১৯৫২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। পনেরো বছর বয়সি আনিসুজ্জামান সে-সময় ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। সংগ্রামীদের ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি, তাঁর সহাধ্যায়ী বন্ধুরা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অকুতোভয় ছাত্ররা পতাকা হাতে সমবেত হয়ে বিরুদ্ধ-পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। সেদিন শাসকদলের সৈনিকদের গুলিতে প্রাণ গিয়েছিল রফিক, সালাম, বরকত, আব্দুলদের। সেই রক্তক্ষয়ী ভাষা-আন্দোলনে প্রত্যক্ষত যুক্ত হওয়ার ফলে আনিসুজ্জামানের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রবল দেশপ্রেম, প্রখর রাষ্ট্রীয় চেতনা। সেই থেকে তিনি আজীবন দেশের মর্যাদা রক্ষার ব্রতে অবিচল এক নাগরিক হিসেবে নিজের মেধা-মনন-ভাবসম্পদ দিয়ে বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন।

ছাত্রাবস্থায় যেমন ভাষা-আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, তেমনি তখন থেকেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দিয়েছিলেন নেতৃত্ব। যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক অন্তিম বর্ষের ছাত্র, সেই ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে আয়োজিত এশীয় লেখক সম্মেলনে সদস্যরূপে যোগ দেন। সম্মেলনটি গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছিল ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, ইজাজ বাটালভী, কাকা কালেলকর, অমৃতা প্রীতম, সাজ্জাদ জহির, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, সজনীকান্ত দাস-এর মতো একঝাঁক যশস্বী এশীয় লেখকদের উপস্থিতিতে। আর সেই সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আরও অনেকের সঙ্গো যোগ দিয়েছিলেন উনিশ বছরের বি.এ. ক্লাসের ছাত্র আনিসুজ্জামান।

পদ্মভূষণ পুরস্কার দিচ্ছেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।

সেই বয়সেই সহাধ্যায়ীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বুলবুল ললিতকলা একাডেমির মতো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য ছিল বুলবুল চৌধুরীর স্মৃতি ও নৃত্যকর্মকে ধরে রাখা এবং দেশে নৃত্যগীতবাদ্য প্রভৃতির চর্চা সম্প্রসারিত করা। এর পৃষ্ঠপোষকতা জোগাড় করেছিলেন এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির মতো প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে, যাঁরা ছিলেন তাঁর পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ। এই সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সুচিত্রা মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাসের অনবদ্য রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় শান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় শ্যামা নৃত্যনাট্য, অভিনীত হয় শম্ভু মিত্রের বহুরূপী দলের 'রক্তকরবী' ও তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'। এইসব ঘটনা সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে আনিসুজ্জামানের দক্ষতাকে চিনিয়ে দেয়।

১৯৫৭-তে এম.এ. ডিগ্রি লাভের পর শুরু করেন গবেষণা। গবেষণার শুরুতেই ১৯৫৮ সালে 'উনিশ শতকের বাঙালি

পিতা ছিলেন খ্যাতনামা হোমিয়ো-চিকিৎসক। মা ছিলেন সাহিত্যরসিক। তাঁর নামে 'হাতেম তাই'-এর একটি বাংলা অনুবাদগ্রন্থ পাওয়া যায়। পিতামহর খ্যাতি ছিল সাপ্তাহিক 'মিহির' ও মাসিক 'সুধাকর' নামে দুটি পত্রিকার সম্পাদনায়। বড়োদিদির কবিতা ছাপা হত 'সওগাত', 'গুলবাগিচা'র মতো পত্রিকায়। সুতরাং জন্মাবধি সাহিত্য-সংস্কৃতির জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে আনিসুজ্জামান ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠেন।

সপরিবারে।

মুসলমান সমাজ ও সাহিত্য' বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখে স্ট্যানলি ম্যারন পুরস্কার লাভ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। ১৯৫৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষক পদে যোগদান। ১৯৬১ সালে বিবাহ। পত্নীর নাম সিদ্দিকা।

আনিসুজ্জামান তাঁর 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯৪৭)' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি জমা দিয়েছিলেন ১৯৬১-র এপ্রিলে। পরীক্ষক ছিলেন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মধ্যযুগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মুহম্মদ এনামুল হক এবং 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'-খ্যাত অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়। এঁরা প্রত্যেকেই গবেষণাকর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা যে-আন্দোলন শুরু করেছিলেন ১৯৫২-য়, এক দশক পেরিয়ে জোরদার হতে শুরু করে পাকিস্তান সরকারের দমনমূলক নীতির কারণে। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি সাধারণত বুদ্ধিজীবীদের আবাসস্থল হয়ে থাকে। সুতরাং যাবতীয় রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আঁতুড়ঘর হিসেবে বিবেচিত হয় সেগুলি। আর ঢাকা যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী এবং তার কেন্দ্রস্থলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তাই স্বভাবতই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বিপ্লব ও বিদ্রোহের ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। সেদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করতে বাংলা বিভাগের অধ্যাপকরা সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। নবীন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৬৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে পর পর সাত দিন মূলত বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় পালন করে 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০'। আনিসুজ্জামানের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল অনুষ্ঠানটিকে সুচারুভাবে আয়োজন করার। এর স্মারকপত্রের প্রকাশনাগত দিকটির পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এই সময় থেকেই আনিসুজ্জামানের আন্তর্জাতিক সারস্বত যোগাযোগগুলি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৬৩-র মাঝামাঝি পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলে যোগ দিয়ে যাত্রা করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর এই বছরের শেষদিকে করাচিতে 'Culture of two worlds' শিরোনামের আন্তর্জাতিক আলোচনায় অংশ নেন।

১৯৬৪ সালে আনিসুজ্জামান যান আমেরিকায়, ফুলব্রাইট বৃত্তি পেয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য। তাঁর লক্ষ্য ছিল পোস্ট-ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন। গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেন উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে ইয়ংবেঙ্গালদের ভূমিকা। এ-ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক এডওয়ার্ড সি ডিমক। স্কলার হিসেবে আনিসুজ্জামানকে এখানে চার-চারটি বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। এ ছাড়া একাধিক সারস্বত সম্মেলনে বক্তা হিসেবে অংশ নিতে গিয়েছিলেন সানফ্রান্সিসকো, ব্লুমিংটন, বোস্টনে। ১৯৬৫-র এপ্রিলে অ্যাসোসিয়েশন ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের বার্ষিক সম্মেলনে সানফ্রান্সিসকোতে গিয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন ১৯৪৭-পূর্ববর্তী বঙ্গাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ওপর। ওই বছর জুনে ব্লুমিংটনে যান শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে। পরের বছর পাকিস্তান কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন-এর ঢাকা কেন্দ্রের অনেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি। লাহোরে যান National Seminar on Drama-তে আমন্ত্রিত হয়ে।

১৯৬৭-র জুনে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন সরকারি ফতোয়া জারি করলেন— পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ-বিরোধী রবীন্দ্রসংগীত আর প্রচার করা হবে না। এমনকী অন্যান্য রবীন্দ্রগানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে। আনিসুজ্জামান ও তাঁর মতাবলম্বী কয়েক জন এগিয়ে এলেন রবীন্দ্র-বিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রতিবাদী জনমত গড়ে তুলতে। তাঁরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন অসংখ্য মানুষের এবং তা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। ঠিক এই সময়টায় তাঁর দুই ছাত্র আহমদ ছফা ও কাজী সিরাজ তাঁকে অনুরোধ করেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পূর্ববাংলার লেখকদের ভাবনা-চিন্তার একটি সংকলন প্রকাশ করতে। আনিসুজ্জামানের একক সম্পাদনায় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ প্রকাশ পেল মোট ৩০ জন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের লেখা সংবলিত 'রবীন্দ্রনাথ' নামের গ্রন্থটি। এর আগে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এমন সারস্বত উদ্যোগ আর দেখা যায়নি।

দশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসেবে কাজ করার পর আনিসুজ্জামান রিডার পদে যোগ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৯ সালে। ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার হতে শুরু করেছে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশব্যাপী যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ বিপুল

আনন্দ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে শঙ্খ ঘোষ ও আনিসুজ্জামান।

ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু জুলফিকার আলি ভুট্টো ঘোষণা করেন, পাকিস্তান পিপলস পার্টির সহযোগিতা না পেলে কেউ সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে না। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রবল অন্তর্বিরোধ চলতে থাকে। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকায় যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তাতে স্পষ্ট ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। সেই উদ্দীপনাসঞ্জাত ভাষণে দেশবাসীর সঙ্গে ৩৪ বছর বয়সি আনিসুজ্জামানও ভাসলেন ভাষাভিত্তিক দেশপ্রেমের জোয়ারে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতার লক্ষ্যে নানা জায়গায় সভা ও মিছিল করলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিসেবীদের একত্রিত করে গঠন করলেন শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ। সংগঠনটির অন্যতম সহ-সভাপতি হন আনিসুজ্জামান। কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির প্রতিরোধ সত্ত্বেও ২৫ মার্চ রাত থেকে শুরু হল পাক-সেনাদের বাঙালি-নিধনযজ্ঞ। আত্মরক্ষার্থে স্বদেশ ও স্বজনদের ছেড়ে আনিসুজ্জামান সপরিবার ভারতে আশ্রয় নেন। কলকাতায় ততদিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের মহারথীরা ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছেন। তাঁদের আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে বসে। পাশাপাশি গঠিত হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। তৈরি হল পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষক সমিতি, যার সম্পাদক পদে বৃত হলেন আনিসুজ্জামান (২১ মে ১৯৭১)। এই সমিতির ওপর দায়িত্ব বর্তেছিল ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন সংকটের স্বরূপটি তুলে ধরা এবং তাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় করা। এ-কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে আনিসুজ্জামান কয়েক জন সহযোগীকে সঙ্গে করে গিয়েছিলেন আলিগড়, বেনারস, দিল্লি ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের কাছে। তাঁরা সাক্ষাৎ করেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও। পরে যে ভারতের তরফে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক সাহায্য প্রদত্ত হয়েছিল, সেই সহযোগিতার পথকে সুগম করেছিল শিক্ষক সমিতির এই কূটনৈতিক দৌত্য। অবশেষে স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশের জয়লাভ। মুক্তিযুদ্ধের গোটা পর্বে একজন জাতীয়তাবাদী ও সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর ভূমিকা আমাদের বিস্মিত না করে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধকালে এই প্রখর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষটি তাঁর আন্তরিকতা, কর্মদক্ষতা ও দেশপ্রেমের নিষ্ঠার কারণে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোদ্ধাদের কাছে এক নির্ভরযোগ্য সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন। যুদ্ধকালীন গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে ডাক পান। ১৯৭২-এ যখন বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, তখন তাঁকে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ড. কুদরত-ই-খুদা। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে নবগঠিত দেশের নবীন প্রজন্মের শিক্ষানীতি নির্ধারণে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একুশে বইমেলায় প্রিয় ছাত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।

আনিসুজ্জামান চিরকালই শিক্ষকতাকে মহৎ বৃত্তি হিসেবে সম্মান জানিয়ে এসেছেন। আর সেই কারণেই বঙ্গবন্ধু তাঁকে শিক্ষা-সচিবের দায়িত্ব দিতে চাইলেও তিনি গ্রহণ করেননি। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য যে-সংবিধান রচিত হয়, তার বাংলা অনুবাদ কমিটির প্রধান ছিলেন তিনি। নিপুণ ভাষাজ্ঞান, অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য এই বিশেষ গৌরবজনক ভূমিকায় তাঁকে বৃত করে।

১৯৭৩ সালে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যান প্যারিস। উদ্দেশ্য ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েন্টালিস্টের দ্বিশতবর্ষ পূর্তির উৎসবে যোগদান। এই বছরের অক্টোবরে আবার বিদেশ ভ্রমণ। এ-বার মস্কোতে। সেখানে ওয়ার্ল্ড পিস ওয়েভে বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন তিনি। তার আগে গিয়েছিলেন হাঙ্গেরিতে, বাংলাদেশ আফ্রো-এশীয় গণসংস্কৃতি পরিষদের সদস্য হয়ে। সেখানে স্বতন্ত্রভাবে আহূত হন লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য। এরই কাছাকাছি সময়ে ফ্রান্সের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে Inequality বিষয়ক সেমিনারেও বক্তৃতা করেন।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে ডাক আসে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের কাছে। কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ নিয়ে সপরিবার ইংল্যান্ড যাত্রা করেন ১৯৭৪-এ। পরের বছর অক্সফোর্ডের নাফিল্ড কলেজে আয়োজিত আলোচনাচক্রে পড়লেন প্রবন্ধ 'Towards a Redefinition of Identty : East Bengal, 1947-71'। ব্রাইটনের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সেমিনারে তাঁর এমনই আরেকটি বক্তৃতা 'The World of the Bengali Muslim Writers in the 19th Century (1870-1920)'। তাঁকে আহ্বান করেছিলেন সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ-খ্যাত অধ্যাপক রণজিৎ গুহ। ১৯৭৬ সালে টোকিয়োতে ইউনেস্কো আয়োজিত এশিয়ার সাংস্কৃতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধি সভায় বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিনিধি হয়ে আনিসুজ্জামান যান জাপান। পরের বছর ফের

ছাত্রাবস্থায় যেমন ভাষা-আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, তেমনি তখন থেকেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দিয়েছিলেন নেতৃত্ব। যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক অন্তিম বর্ষের ছাত্র, সেই ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে আয়োজিত এশীয় লেখক সম্মেলনে সদস্যরূপে যোগ দেন।

জানাজা।

লন্ডন। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির পরিচালক জোন ল্যানকাস্টার-এর আমন্ত্রণ ছিল ওই লাইব্রেরির রেকর্ডসে পড়ে থাকা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঢাকা কুঠির কাগজপত্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করার জন্য। এই অ্যাকাডেমিক প্রয়াসের ফল ১৯৮১-তে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদনায় 'Factory correspondence and other Bengali documents in the India Office Library & Records'। জাপানে দ্বিতীয়বার অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের যাওয়ার সুযোগ আসে ১৯৭৮-এর নভেম্বরে। এ-বার কিয়োটোতে। সেখানে 'Asian Symposium on Intellectual creativity in Endogenous Culture' শীর্ষক এক সেমিনারে যোগ দিতে।

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯৮১-র ডিসেম্বরে আনিসুজ্জামান যান আলজিরিয়া। সেমিনারের বিষয় 'Culture and thought in the Transformation of the World'। আলজিরিয়া থেকে ফ্রান্সে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনালকো' (আঁস্তিত্যু নাসিয়োনাল দ্যে লংগ এ সিভিলিজাসিওঁ ওরিয়ঁতাল)-তে দেন একটি বক্তৃতা। প্যারিস থেকে লন্ডন। লন্ডনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবিনসন কলেজে যোগ দেন একটি আলোচনাচক্রে। শিরোনাম 'Geo-Political Visions of the world'। ১৯৮৩-র জানুয়ারি। এ-বার জাপান। এটা তৃতীয়বার। গেলেন ৎসুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। পরে কুয়েত। সেখানে বলেন 'An out-sider's view of Arab Indigenous Intellectual Creativity' নিয়ে। আরও পরে পা পড়বে শ্রীলঙ্কায়, আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের এক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে। আর তাঁর প্রকৃত জন্মভূমি, পরবর্তীকালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে গবেষণা, সেমিনার, ভিজিটিং ফেলো, বহিরাগত বিশেষজ্ঞ হয়ে কতবার যে এসেছেন, তার হিসেব রাখাই শক্ত। তবু তথ্য হিসেবে থাক— ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস ও ইউনেস্কো যৌথ উদ্যোগে দিল্লিতে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। বিষয় 'Interface of Cultural Identity and Development'। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সেখানে বক্তা হিসেবে আহূত। আর ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত ইন্দিরা গান্ধী স্মারক বক্তৃতায় বলেন 'Cultural Pluralism' নিয়ে।

এই বরেণ্য শিক্ষক, প্রগতিশীল সংস্কৃতি-চিন্তক, আদ্যন্ত সমাজমনস্ক মানুষটি আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী।

১৯৬৪-তে সেই যে দেশের সীমানা টপকাতে শুরু করেন, টানা সাড়ে পাঁচ দশক চলে দেশে দেশে তাঁর সাংস্কৃতিক সফর। পার্কসার্কাসের এক অখ্যাত স্কুলের অতি সাধারণ পড়ুয়া থেকে তিনি কীভাবে নিজের মেধা, মনন, জেদ আর আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে দিনে দিনে হয়ে ওঠেন একজন ইন্টারন্যাশনাল প্রোফাউন্ড স্কলার, সে-কথা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সেই যে প্রত্যক্ষ অংশ নেন, তারপর যতবার মানুষের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হয়েছে, ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ঘটেছে, ততবার তিনি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন। আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল, চরিত্রগুণে বিভূষিত, বাক্‌স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, মানবাধিকার রক্ষায় অটল মানুষটি প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ে উঠেছিলেন জাতির জাগ্রত বিবেক।

বাঙালি মুসলমান সমাজের সময়ানুক্রমিক রূপান্তর তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। তার প্রমাণ রয়ে গেছে তাঁর 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৪) ও 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ১৮৩১-১৯৩০' (১৯৬৯) বইদুটিতে। এ ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— 'স্বরূপের সন্ধানে' (১৯৭৬), 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি' (১৯৮৩), 'পুরোনো বাংলা গদ্য' (১৯৮৪) এবং 'পূর্বগামী' (২০০১)। 'কাল নিরবধি' (২০০৩), 'আমার একাত্তর' (১৯৯৭) ও 'বিপুলা পৃথিবী' (২০১৫)— এই তিনটি ধারাবাহিক আত্মকথা ছাড়া লিখেছেন 'মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পর' (১৯৯৮) ও 'আমার চোখে' (১৯৯৯)। ইংরেজিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর তিনটি গ্রন্থ — 'Creativity, Identity and Reality' (১৯৯১), 'Cultural Pluralism' (১৯৯৩) এবং 'Identity, Religion and Recent History' (১৯৯৫)। তাঁর একক ও যৌথভাবে সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়।

সুবিপুল পাণ্ডিত্য ও দুনিয়াব্যাপী খ্যাতি আনিসুজ্জামানকে নানা সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত করেছে। ১৯৭০ সালে পান বাংলা একাডেমির তরফে সাহিত্য পুরস্কার। শিক্ষায় তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' দ্বারা ভূষিত হন ১৯৮৫-তে। ১৯৯৪ সালে পান 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার' সিরিজের জন্য আনন্দ পুরস্কার। ২০০৫ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান সাম্মানিক ডি.লিট.। ২০০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান সরোজিনী বসু পুরস্কার। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ২০১১ সালে তাঁকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বর্ণপদকে সম্মানিত করে। ২০১৪ সালে ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে লাভ করেন পদ্মভূষণ উপাধি। পরের বছর বাংলাদেশ সরকার প্রদান করে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কার। দ্বিতীয়বার আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন ২০১৭-তে, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের আত্মকথন 'বিপুলা পৃথিবী' বইটির জন্য। ২০১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান জগত্তারিণী স্বর্ণপদক-এ ভূষিত হন। আর নিজের দেশে বৃত হন জাতীয় অধ্যাপক-এর অতি সম্মাননীয় পদে। তাঁর হাতে পদক ও শংসাপত্র অর্পণ করেছিলেন তাঁরই প্রাক্তন ছাত্রী ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর ২০১৯-এ পান সার্ক কালচারাল সেন্টার থেকে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিজগতের মানুষ হয়ে তাঁর মতো বিপুল আন্তর্জাতিক খ্যাতি বাংলাদেশে অধুনাতন কালে আর-কেউ পাননি। বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের বিরল গুণসম্পন্ন এই মানুষটির মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হল বাংলাদেশের একটি সাংস্কৃতিক অধ্যায়ের। ■

(সূত্র: উইকিপিডিয়া, দৈনিক ইত্তেফাক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা)

গত চৌত্রিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় সহকারী অধ্যাপক

আয়াতুল্লা ফারুক মোল্লা

গণ্ডগ্রাম থেকে গবেষণা-বিশ্বে

আসাদুল ইসলাম

এ-বছর করোনা মহামারির বিষণ্ণতা ছেয়ে আছে বিশ্বজুড়ে। অতিমারির থেকে বাঁচতে সরকার আরোপিত ঘরবন্দি অবস্থা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। রাস্তাঘাটে মানুষের আনাগোনা কম। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। কতদিন এমন চলবে, কবে স্বাভাবিক হবে কে জানে— মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে হা-হুতাশের স্বর। সেই স্বরে মিশে আছে চাপা আর্তনাদ। এরকম সময় যখন পার হয়ে যাচ্ছে আমাদের সামনে দিয়ে তখন কলকাতা শহরের নির্জন এক প্রান্তে মুখোমুখি দুই যুবক। বেলা গড়িয়েছে অনেকটা। দুই যুবক যেখানে বসে আছেন, সেখান থেকে বেলা বয়ে যাওয়ার ছবি ধরা যায় না। চার দেয়ালের শহুরে জীবন মানুষকে অনেক কিছুই বুঝতে দেয় না। ওই দুই যুবকের একজন ইঞ্জিনিয়ার। অধ্যাপনা করেন শহরের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁকেও দেখে যেমন বর্তমানের যে-অবয়বে তিনি নাগরিক জীবন কাটাচ্ছেন এখন, বোঝার উপায় নেই কী নিদারুণ এক জীবন পার করে এসেছেন তিনি। অপর যুবক এক লিপিকর— মানুষকে জানার, মানুষের জীবনকে জানার খেলায় যিনি সঙ্গী হয়ে বসে যান উলটোদিকে। খেলার আজ সঙ্গী হয়েছেন ওই ইঞ্জিনিয়ার-অধ্যাপক। তাঁর মায়াবী অতীত কথা বলতে চায়। তিনি বলতে শুরু করেন তাঁর লড়াই, সংগ্রাম, ফেলে আসা জীবনের কথা। কেঁপে ওঠা স্মৃতির পর্দায় আঁকা হয় এক সংগ্রামী জীবনের ছবি। আসুন সে ছবিতে চোখ রাখি।

কলকাতা থেকে উলুবেড়িয়ার দূরত্ব চল্লিশ-বিয়াল্লিশ কিলোমিটার। উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে দক্ষিণে, মাতাপাড়া-উলুবেড়িয়া রোড ধরে আট-দশ কিলোমিটার গেলে পড়বে নিশ্চিন্দাপুর গ্রাম। হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার মধ্যে পড়ে। হাওড়া জেলা হুগলি নদীর পশ্চিম পাড়ে, যে-পাড় জুড়ে ইংরেজ আমল থেকেই গড়ে উঠেছে নানা কলকারখানা। এইসব শিল্প, কলকারখানার হাত ধরে নগরজীবনের প্রসার ঘটেছে। উন্নয়নের আলো শিল্পাঞ্চল এলাকায় ছড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু গ্রামীণ হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় সেই আলোর ছটা পৌঁছোনোর আগেই বিলীন হয়ে গেছে বাতাসে। কলকাতার মতো বাণিজ্যনগরীর এত কাছের জেলা এবং

যে-জেলার বেশ কিছুটা অংশ শিল্পসমৃদ্ধ, তার পরেও বিরাট গ্রামীণ অংশ কীভাবে অনালোকিত হয়ে রইল, সে এক আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে। এই জেলার যে প্রায় ২৭ শতাংশ সংখ্যালঘু মুসলমান বসবাস করেন, তার সিংহভাগই গ্রামীণ হাওড়ার বাসিন্দা। গ্রামীণ হাওড়ায় পা ফেললেই দেখতে পাওয়া যায় নাবাল জমির বুক জুড়ে আছে হোগলার বন, ছোটো ছোটো পুকুর-ডোবা ঘেঁষে জেগে থাকা ডাঙায় গড়ে উঠেছে মানুষের বসতবাড়ি। এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা চাষবাস। প্রধান ফসল ধান। ছোটোখাটো ব্যাবসা করেন অনেকে। জরির কাজ এক সময় ভালোই ঢেউ তুলেছিল গ্রামজীবনে। সেসব থিতিয়ে গেছে এখন। বম্বে রোড চালু হওয়ার পর থেকে বদলের হাওয়া বইছে হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। বছর কুড়ি-পঁচিশ আগের নিশ্চিন্দাপুরে এখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন গ্রামে সন্ধ্যে হলে ঘন অন্ধকার নেমে আসত। বিদ্যুতের আলো ছিল কল্পনার বিষয়। গ্রামের রাস্তাঘাট প্রায় সবই মাটির। উলুবেড়িয়া থেকে মাতাপাড়া যাওয়ার পাকারাস্তাটা ছিল কোনোমতে একটা বাস যাওয়ার মতো। সারাদিন ক-টা বাস যায়-আসে আঙুলের গাঁট গুনে মনে রাখা যেত অনায়াসে। গ্রামের প্রায় সবারই মাটির বাড়ি, খড় বা টালির ছাউনি দেওয়া। নিশ্চিন্দাপুর পুরো গ্রামটাই মুসলমান অধ্যুষিত। অজপাড়া-গাঁ বললে যেমন ছবি ভেসে ওঠে, ঠিক তেমনই। ওরকম এক গ্রামে, মাটির ঘরে ১৯৮৪ সালের ১২ অগাস্ট জন্ম নিয়েছিলেন আয়াতুল্লা ফারুক মোল্লা— মরহুম নূর মহম্মদ মোল্লা ও জরিনা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান। ২০১১ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী হাওড়া জেলায় সাক্ষরতার হার প্রায় ৮০ শতাংশ। অর্থাৎ ২০ শতাংশ মানুষ নিজের নামটুকুও লিখতে পারেন না। ষাট-সত্তর বছর আগে, আয়াতুল্লার আব্বা-মার যখন পড়ালেখা শেখার বয়স, তখন চিত্র কেমন ছিল, তা আন্দাজ করেও কূল পাওয়া দুষ্কর। নূর মহম্মদ সাহেব ও জরিনা বিবি প্রাইমারির গণ্ডি পার করতে পারেননি। হয়তো সেই আফশোস থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিদ্যানুরাগ। নিজের সন্তানসন্ততিদের পড়াশোনা শেখানোর চেষ্টা জারি রেখেছিলেন হাজার দুঃখ-কষ্ট সয়েও।

আয়াতুল্লার প্রাথমিক পড়াশোনা বেলাড়ী মুসলিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বাড়ি থেকে এক-দেড় কিলোমিটার দূরের সেই স্কুলে যেতে হত মাটির রাস্তা ধরে, বর্ষায় জলকাদা ভেঙে। স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন চালু ছিল। কিন্তু প্রতি শ্রেণির জন্য আলাদা করে কোনো ক্লাসরুম ছিল না। একটাই হলরুম, সেটাই ভাগ করে বসত ছেলে-মেয়েরা। যেমন স্কুলের হাল তেমনি ছিল সেই স্কুলের পড়ুয়াদের বাড়ির হাল। আয়াতুল্লাদের কথাই ধরুন, আয়াতুল্লারা চার ভাই, পাঁচ বোন। মা-আব্বাকে নিয়ে এগারো জনের বিরাট সংসার। দু-তিন কামরা মাটির ঘরে থাকতেন। কোনো জমিজমা ছিল না। তাঁদের সকলের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিল একটা ছোটো মুদিখানা। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখার পরও সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হত তাঁর আব্বাকে। দীর্ঘ সময় দোকান খোলা রাখতে হত বলে আয়াতুল্লা ও তাঁর ভাইয়েদেরও সকাল-সন্ধ্যায় দোকানে বসতে হত। দোকানে না গেলে মায়ের কাছে বকুনি খেতে হত। একদিন, আয়াতুল্লা তখন ক্লাস টু-থ্রিতে পড়েন, স্কুল থেকে ফিরে খেলতে চলে গিয়েছিলেন। খেলা শেষে ঘরে ঢুকতে ভয় করছিল। মায়ের বকার ভয়ে, একটু দূরে দূরে থাকছিলেন। কিন্তু দেখলেন গম্ভীর হয়ে থাকা মা কিছুই বলছেন না। মন খারাপ হল আয়াতুল্লার। উপলব্ধি করলেন তিনি ভুল করেছেন। খেলাধুলো করার বিলাসিতা তাঁদের জন্য নয় বুঝে গেলেন সেই শিশু। সকালে স্কুল যাওয়ার আগে এবং স্কুল থেকে ফিরে বিকেলে দোকানে বসা রুটিন হয়ে গেল। আর-একটু বড়ো হতে আর-একটা দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়ল আয়াতুল্লার। হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় থেকে দোকানের মাল নিয়ে আসা শুরু হল। বাড়ির কাছাকাছি একটা হাই স্কুল থাকলেও সেখানে ভর্তি না করে আয়াতুল্লাকে একটু দূরের পালপাড়া গোবিন্দজিউ হাই স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল শুধু এই কারণে যে, স্কুল থেকে ফেরার সময় বাগাণ্ডা থেকে দোকানের মাল নিয়ে আসতে পারবেন। যখন হাফ প্যাডেলে সাইকেল চালাতেন তখন থেকেই মাল আনতেন, তবে তা ছিল অনিয়মিত। ভালোভাবে সাইকেল চালাতে পারার পর সেটা তাঁর নিয়মিত কাজ হয়ে যায়। স্কুল যাওয়ার সময় মাল আনার ব্যাগপত্তর নিয়ে নিতেন, ফেরার পথে দুটো হ্যান্ডেলে দুটো ব্যাগে এবং পেছনে ক্যারিয়ারে মাল বেঁধে আনতেন। মালের ভারে টলমল করত সাইকেল। কতবার যে রাস্তায় মালপত্তর পড়ে ছড়িয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। পড়ে যাওয়া মাল যতটা পারা যায় কুড়িয়ে আবার যখন ব্যাগে ভরতেন তখন বুকের মাঝে জমে থাকা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইত প্রাণপণে। নীরবে চোখ মুছে আবার চাপ দিতেন সাইকেলের প্যাডেলে। দোকানের কাজ করে স্কুলে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যেত মাঝে মাঝেই। সময়ে বই-খাতা জোগাতে পারেননি আব্বা-মা। নতুন বই পাওয়া তো দূরের কথা পুরোনো বই পাওয়াকেই সৌভাগ্য ভেবেছেন। খাতার অভাব ঘোচাতে স্কুল থেকে আনা ভাঙা চক দিয়ে অঙ্ক কষেছেন পড়ার টেবিলে। সংসারকে সচল রাখতে বাড়ির সকলে মিলেই পরিশ্রম করেছেন। নিজেদের জমি ছিল না বলে অন্যের জমি জমায় নিয়ে চাষ করেছেন। সেই জমিতে ডুঙি করে পানি দেওয়া থেকে ধান কাটা-তোলা সবই করতে হয়েছে আয়াতুল্লাকে। আরও একটু বাড়তি আয়ের আশায় ৫৮ গেট বাজারে চাল-ডাল বিক্রি করেছেন। বাড়ির সবাই মাছ ধরার মুগুরি বুনতেন, সেই মুগুরিও বাজারে বিক্রি করেছেন। আয়াতুল্লা একবার নিজের দক্ষতার পরীক্ষা নিতে গিয়ে বড়োদের সাহায্য ছাড়াই বাঁশ থেকে কাঠি তুলে একটা মুগুরি বানালেন। বাজারে বিক্রি করে পেয়েছিলেন আট টাকা। নিজের উপার্জনের সেই আট টাকাকে মুঠোর মধ্যে ধরে মনে হয়েছিল সাত রাজার ধন পেয়েছেন। বাড়ির সকলে মিলে আম দিয়ে ভাত খাবেন ভেবে, খুশি মনে আম কিনেছিলেন। খাওয়ার সময় আয়াতুল্লারা দেখলেন সেই আম প্রচণ্ড টক। ভাইবোন সবাই মিলে খুব হেসেছিলেন। সে-হাসিতে

> আয়াতুল্লারা চার ভাই, পাঁচ বোন। মা-আব্বাকে নিয়ে এগারো জনের বিরাট সংসার। দু-তিন কামরা মাটির ঘরে থাকতেন। কোনো জমিজমা ছিল না। তাঁদের সকলের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিল একটা ছোটো মুদিখানা।

লেগেছিল বছর বারো-তেরোর এক বালকের বর্ণহীন কান্নার দাগ। আয়াতুল্লা সত্যি-সত্যি একদিন প্রায় সারাদিন কেঁদেছিলেন। মাধ্যমিকে লিখিত পরীক্ষার মাস খানেকের মাথায় ঘটেছিল সেই ঘটনাটা। ওয়ার্ক এডুকেশন পরীক্ষার দিন। ওই দিন যথারীতি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় আয়াতুল্লার হাতে দোকানের মাল আনার স্লিপ, টাকা, ব্যাগ ধরানো হল। আয়াতুল্লা চাইছিলেন পরীক্ষার দিনটা অন্তত তাঁকে ছুটি দেওয়া হোক, যাতে পরীক্ষাটা ভারহীন হয়ে দিতে পারেন। কিন্তু অভাবের সংসার সে-কথা শুনবে কেন? বাধ্য হয়ে ব্যাগপত্তর নিয়ে সাইকেলে যখন স্কুলের দিকে রওনা হলেন, তখন আর কান্নাকে চেপে রাখতে পারলেন না। সারারাস্তা ধরে কেঁদে কেঁদে স্কুলে গিয়েছিলেন। যাতে বুক ভরে কাঁদতে পারেন, অন্য পথচারীরা দৃষ্টি ফেলে তাঁর কান্নায় ব্যাঘাত ঘটাতে না পারেন, তার জন্য রুমাল দিয়ে ঢেকে নিয়েছিলেন মুখটা। চোখ থেকে বয়ে আসা কান্না শুষে নিচ্ছিল রুমালটা। ওই দিন পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরও আর বাড়ি ফিরতে মন চাইছিল না বলে স্কুলের কাছে একটা মাঠে বসেছিলেন দীর্ঘক্ষণ। বাড়ি না ফেরায় খুঁজতে খুঁজতে স্কুলের কাছে পৌঁছে বাড়ির লোক ফিরিয়ে এনেছিলেন আয়াতুল্লাকে।

সংগ্রামী যুবক আয়াতুল্লা পড়াশোনায় কেমন ছিলেন? প্রাইমারিতে পড়ার সময় ফাস্ট-সেকেন্ড হতেন। হাই স্কুলে ক্লাস ফাইভে যখন ভর্তি হন তখন তাঁর রোল নম্বর ছিল ১০১, কারণ, সবার শেষে ভর্তি হয়েছিলেন। ক্লাস সিক্সে আয়াতুল্লার রোল হয় ১০, শেষের ১-টা বাদ যায়। এরপর সেভেনে সিক্সথ, এইটে থার্ড, নাইনে সেকেন্ড এবং টেনে গিয়ে ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট হন। পড়াশোনায় ক্রমাগত উন্নতি করায় স্কুলের স্যারেরাও ভালোবাসতে শুরু করেন। ক্লাস সেভেন থেকে টিউশনি পড়া শুরু করেন। তাঁর বড়োভাই ইংরেজি অনার্স করেছেন, তাঁর কাছে ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপটা পড়তেন। আর অঙ্ক-বিজ্ঞান পড়ার জন্য যেতেন দাদার বন্ধু অরূপ মণ্ডলের কাছে। অরূপ স্যার আয়াতুল্লাকে শুধু বিনা বেতনে পড়াতেন না, নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। বাড়িতে গিয়ে খোঁজও নিতেন। পড়াশোনায় ভালো হওয়ায় আয়াতুল্লার ওপর থেকে দোকানের মাল আনার চাপ কমাতে তাঁর মেজোভাইকেও আয়াতুল্লার স্কুলে ভর্তি করা হয়। নাইন-টেন— এই দু-বছর পড়ার জন্য বাড়তি সময় যাতে পান আয়াতুল্লা, সেদিকে নজর দিয়েছিলেন অভিভাবকরা। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২০০০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেলেন ৬৭৮ নম্বর, প্রায় ৮৫ শতাংশ। তখন পর্যন্ত সেটাই ছিল ওই স্কুল থেকে পাওয়া কোনো পড়ুয়ার মাধ্যমিকের সর্বোচ্চ নম্বর। মাধ্যমিকের পর কোথায় ভর্তি হবেন, সে-কথা ভাবতে গিয়ে আয়াতুল্লার অভিভাবকরা জানতে পারেন আল-আমীন মিশনের কথা। আয়াতুল্লার স্কুলের মেধাবী প্রাক্তনী সৈয়দ আক্তার আলি, খুবই দুঃস্থ পরিবারের ছেলে। হাওড়া জেলার খলতপুরের আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আক্তারকে যিনি ভর্তি করে দিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে মাধ্যমিকের মার্কসিট হাতে করে আব্বা ও দাদার সঙ্গে আয়াতুল্লা পৌঁছোলেন মিশনে। প্রথম পর্যায়ের ভর্তি আগেই হয়ে গেছে। মাধ্যমিকের ফলের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তি চলছে তখন। মার্কস দেখে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম উৎসাহ দিলেন। কিন্তু সমস্যা হল বেতন নিয়ে। মিশন থেকে নির্ধারিত বেতনের অর্ধেক ছাড়ের কথাও জানানো হয়। কিন্তু সেটাও বয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর জানান আয়াতুল্লার আব্বা। সম্পাদক আশ্বাস দেন টার্মিনাল পরীক্ষায় ভালো ফল হলে আরও কমিয়ে দেওয়া হবে। আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়ে গেলেন আয়াতুল্লা ফারুক মোল্লা। শুরু হল তাঁর জীবনের নতুন উড়ান।

আল-আমীন মিশনে এসে প্রথম দিকে খুবই খারাপ লাগত। বাড়ির জন্য মন খারাপ থাকত। তখন মিশনের একটিই ব্রাঞ্চ। হস্টেল বিল্ডিঙে জায়গা না হওয়ায় আয়াতুল্লার মতো কয়েক জনকে মাদ্রাসা বিল্ডিঙে থাকতে হয়েছিল। সেখানে টিনের চালের জন্য দিনে প্রচণ্ড গরম, রাতে মশার উৎপাত। ওই কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছিল মিশন পরিবারের আন্তরিক ভালোবাসা। প্রতিটা স্যার

তাঁর সর্বোচ্চ দক্ষতা দিয়ে পড়াতেন। স্যারদের প্রচেষ্টা দেখে ছাত্ররাও চেষ্টা করতে কসুর করত না। আয়াতুল্লা ক্লাস ইলেভেনে মিশনের মধ্যে প্রথম দশে চলে আসেন। মিশন ফিজও কমিয়ে দেয় অনেকটাই। ক্লাস টুয়েলভ থেকে হস্টেল বিল্ডিঙে থাকার সুযোগ পেলেও তখন মিশনের অবস্থা আজকের মতো ছিল না মোটেই। টয়লেটের জন্য বিল্ডিং থেকে নেমে হেঁটে যেতে হত অন্যপ্রান্তে। চাপা কল থেকে পাম্প করে পানি নিতে হত। পরিকাঠামো ঠিকমতো ছিল না ঠিকই, কিন্তু আন্তরিকতা, ছাত্রদের পাশে থাকার ইচ্ছেয় ফাঁক ছিল না। সেক্রেটারি স্যারের উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতা তো ছিলই, আয়াতুল্লাদের সময়ে মিশনে এসেছিলেন ব্যাঙ্গালোর আল-আমীন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ডা. মুমতাজ আহমেদ খান, আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক মিলন দত্ত। ওইসব প্রখ্যাত ব্যক্তির আগমন মিশনে পড়ুয়াদের মনে বহির্বিশ্বের বিরাট জগতের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে দিয়েছিল। আয়াতুল্লা মিশনে ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারেননি, তবে অঙ্ক ও ফিজিক্সে প্রথম হওয়া প্রায় বাঁধা ছিল। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বন্ধুদের হারিয়ে প্রথম হয়েছিলেন। 'বড়ো হতে হলে স্বার্থপর হতে হবে' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিপক্ষে বলেছিলেন তিনি। মিশন থেকে ২০০২ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিলেন ৮৫.৭ শতাংশ নম্বর। মাধ্যমিক পরীক্ষায় একটা আফশোসের জায়গা তৈরি হয়েছিল আয়াতুল্লার মনে। তিনি অঙ্কে ৯৯ নম্বর পেয়েছিলেন, ১০০ পাননি। উচ্চ-মাধ্যমিকে সেই আফশোস মিটে গিয়েছিল, ১০০-য় ১০০ পেয়েছিলেন। ওই বছরই জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিঙে আয়াতুল্লার র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ১১৮ এবং জয়েন্ট মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৯১৭। আয়াতুল্লাদের ব্যাচের বিষয়ে কিছুটা বলা দরকার। ২০০২ সালের ওই ব্যাচে ৬০ জনের মতো ছাত্র ছিলেন। ৬০ জনের মধ্যে জনা পঁয়তিরিশ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। সেখ হাম্মাদুর

২০১৮ সালে তিনি পোল্যান্ডের ওয়ারস ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ করেছেন। বর্তমানে বায়োইনফর্মেটিকস, প্যাটার্ন রিকগনিশন অ্যান্ড মেশিন লার্নিং, হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের পিএইচ.ডি. গবেষণায় গাইড হিসেবে সহযোগিতা করছেন।

রহমান জয়েন্ট মেডিকেলে ১০ এবং ইঞ্জিনিয়ারিঙে ৯৬ র‍্যাঙ্ক করেছিলেন। মেডিকেলে মুর্শেদ আলম ৯২, মানোয়ার হোসেন ১২৭, মহম্মদ আলি ১২৮— এমন চমকপ্রদ র‍্যাঙ্ক হয়েছিল সে-বার। হাম্মাদুর এবং মহম্মদ আলি ভারত সেরা প্রতিষ্ঠান থেকে ডি.এম. করেছেন— তাঁদের কথা 'আল-আমীন বার্তা'য় আগেই লিখেছি। এঁরা ছাড়াও আলতাফ, আবদুল্লাহ, তানবির, হাবিবুরদের মতো অনেক বন্ধুই যে ডাক্তার হয়েছেন, তা জানান আয়াতুল্লা। ওই ব্যাচের প্রায় সকলেই প্রতিষ্ঠিত। মসিউল ইসলাম যেমন পিএইচ.ডি. করে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হয়েছেন, তেমনি অনেকেই শিক্ষকতার পেশায় গেছেন।

আয়াতুল্লা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে বি-টেক করতে ভর্তি হলেন। বি-টেক পড়ার খরচ চালাতে ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক প্রদত্ত লোন-স্কলারশিপ বিরাট সাহায্য করেছিল। পাশাপাশি তিনি টিউশন পড়িয়ে কিছু অর্থ পেতেন। সরকারি কলেজ হওয়ায় খরচ কম ছিল তাই স্কলারশিপ আর টিউশনি পড়ানোর অর্থে পড়াশোনা চালাতে অসুবিধা হয়নি। আল-আমীন মিশনের এবং বাইরেরও বহু মেধাবী পড়ুয়াকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে আইডিবি লোন-স্কলারশিপ। আয়াতুল্লা জানালেন— তিনি আইডিবি লোন-স্কলারশিপের অর্থ শোধ করে দিয়েছেন। আইডিবি-র সঙ্গে আয়াতুল্লার আর-একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতি আছে। যাঁরা আইডিবি লোন-স্কলারশিপ পান, সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা পরীক্ষা নেওয়া হয় এক্সেলেন্স পারফর্ম্যান্স অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার লক্ষ্যে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত ওই পরীক্ষায় এক-একটা অঞ্চলে যিনি প্রথম হন, তাঁকে পুরস্কার হিসেবে বিনা খরচে উমরাহ করানো এবং জেদ্দায় অবস্থিত আইডিবি-র প্রধান কার্যালয় ঘুরিয়ে দেখানো হয়। ইস্টার্ন জোনের মধ্যে ২০০৬ সালের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আয়াতুল্লা ওই সুযোগ পেয়েছিলেন। ২০০৬ সালেই বি-টেক শেষ করে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে একটি ইলেকট্রনিক ডিজাইন অটোমেশন কোম্পানিতে চাকরি পান। দিল্লির নয়ডাতে দু-বছর ওই কোম্পানিতে চাকরি করার পর ২০০৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. করতে চলে আসেন। ইউজিসি ফেলোশিপ নিয়ে 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড কম্পিউটার ভিশন' বিষয়ে গবেষণা করে ২০১৩ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি পান। এরপর পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ করার জন্য আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ আমব্রিয়া থেকে অনুমতি পান। ওই সময়ই তিনি এনআইটি পাটনা এবং আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে চাকরি করার সুযোগ পান। পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ মাত্র ছ-মাসের জন্য এবং চাকরি নয় বলে অধ্যাপনার চাকরি করার সিদ্ধান্ত নেন। ইতোমধ্যে তিনি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সহ কলকাতার আরও দু-একটি কলেজে অতিথি শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছিলেন। আলিয়ার সার্বিক পরিবেশের সঙ্গে পূর্বপরিচিতি থাকায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই চাকরি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে চাকরি করছেন। আলিয়াতে চাকরি নেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে তাঁকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি যোগ্যতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৮ সালে তিনি পোল্যান্ডের ওয়ারস ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ করেছেন। বর্তমানে বায়োইনফর্মেটিকস, প্যাটার্ন রিকগনিশন অ্যান্ড মেশিন লার্নিং, হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের পিএইচ.ডি. গবেষণায় গাইড হিসেবে সহযোগিতা করছেন। দেশি-বিদেশি জার্নালে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমন্ত্রিত বক্তা হয়ে দেশি-বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন।

মাত্র ৩৬ বছর বয়সে আয়াতুল্লা ফারুক মোল্লা যে-সাফল্য পেয়েছেন, তা এক সময় শুধু নিশ্চিন্দাপুর গ্রামের মানুষের কাছেই নয়, আয়াতুল্লার আত্মীয়স্বজনদের কাছেও ছিল অভাবনীয়। আয়াতুল্লার গ্রামের স্কুলের সহপাঠী, যাঁরা আয়াতুল্লার সঙ্গে পরীক্ষায় প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে থাকতেন, তাঁরা সবাই ছিলেন প্রতিবেশী সমাজের অগ্রসর পরিবারের সন্তান। তাঁরা স্কুল-শিক্ষক হয়েছেন, কেউ প্রাইমারির কেউ হাই স্কুলের। আয়াতুল্লা বড়ো স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই, প্রায় নিরক্ষর বাবা-মার সন্তান হয়েও বন্ধুদের ছাড়িয়ে গিয়ে বিরাট এক সম্ভাবনাময় আকাশের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছেন। আর আয়াতুল্লাকে স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সমাজের স্বপ্ন-প্রতিষ্ঠান আল-আমীন মিশন।

লিপিকর যুবক আয়াতুল্লার কথা লিপিবদ্ধ করতে করতে ভাবতে থাকেন। তাঁর সামনে স্পষ্ট দুটি ছবি ভেসে ওঠে। ছবিদুটো অনেক টুকরো ছবির কোলাজ। প্রথম ছবিতে দেখতে পান, এক গ্রাম্য বালক সকাল-বিকাল পিতাকে দোকানে সাহায্য করার পর মাটির ঘরে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বেলে পড়ছেন। ক্লান্তিতে ল্যাম্পের ওপর ঢলে পড়ে যাতে কোনো বিপদ না ঘটান, তার জন্য জেগে বসে আছেন তাঁর স্নেহময়ী মা। ওই বালক স্কুলে যাচ্ছেন কিন্তু সময়ে বই-খাতা পাচ্ছেন না, স্কুলে পাঁচ ঘণ্টা কাটাচ্ছেন কিন্তু টিফিন করা কী জিনিস তা জানছেন না। স্কুল-শেষে সন্ধ্যার মুখে সাইকেলের পেছনে-সামনে মাল নিয়ে আসার সময় বাসের সামনে পড়তে গিয়ে কপাল জোরে বেঁচে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় ছবিতে, এক যুবক নামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন, গবেষণা করছেন, বিদেশে রিসার্চ করার ডাক পাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াচ্ছেন, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে গুণী মানুষদের সামনে বক্তব্য রাখছেন, এক-জীবনে এতকিছু পাওয়া ও না-পাওয়ার জন্য সেজদারত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন স্রষ্টাকে।

চোখের সামনে পাশাপাশি দুটো ছবি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়। যুবকটি খাতা-পেন গুটিয়ে নিতে শুরু করেন। এই পর্বের খেলা শেষ বুঝতে পেরে ইঞ্জিনিয়ার-অধ্যাপক হালকা হেসে বিদায় নেন। লিপিকর দেখেন, সেই হাসিতে লেগে আছে বছর বারো-তেরোর এক বালকের বর্ণহীন কান্নার দাগ। মুগুরি বিক্রি করে পাওয়া অর্থে কিনে আনা সেই কান্না যে এখনও বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। ■

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল প্রাপ্তির খবরে আব্দুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব, সংক্ষেপে জে-প্যাল-এর নাম আমরা সকলেই শুনেছি। কিন্তু সেই পরিসরে উক্ত প্রতিষ্ঠান নিয়ে পত্র-পত্রিকায় দ্বিতীয় কোনো বাক্য উচ্চারিত না-হওয়া বিস্ময়ের। এ-সংখ্যায় রইল সেই বিষয়কে ভিত্তি করে তাঁর অমূল্য কাজের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি।

দারিদ্র্যের উৎস সন্ধানে

একরামূল হক শেখ

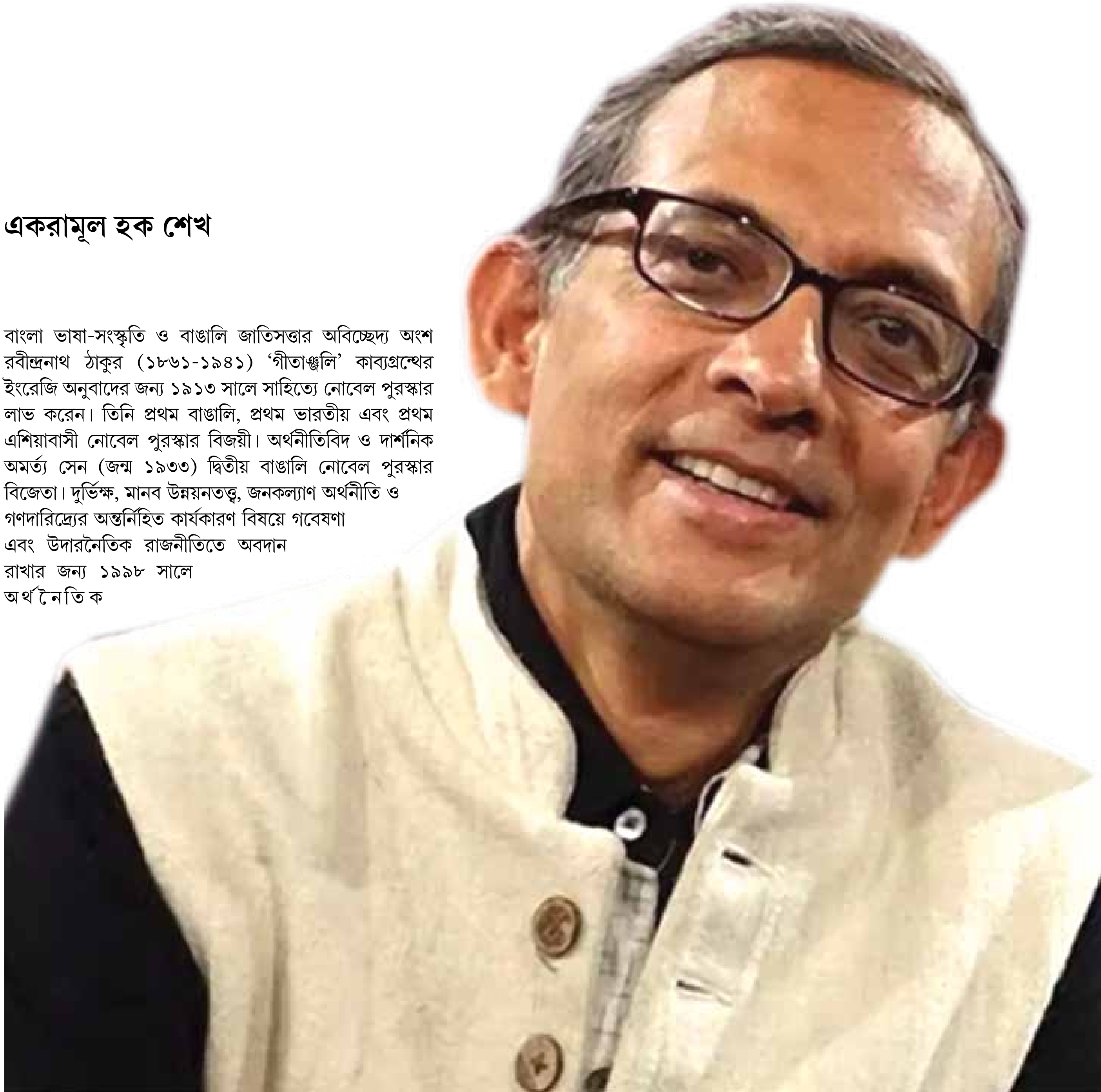

বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্রথম বাঙালি, প্রথম ভারতীয় এবং প্রথম এশিয়াবাসী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক অমর্ত্য সেন (জন্ম ১৯৩৩) দ্বিতীয় বাঙালি নোবেল পুরস্কার বিজেতা। দুর্ভিক্ষ, মানব উন্নয়নতত্ত্ব, জনকল্যাণ অর্থনীতি ও গণদারিদ্র্যের অন্তর্নিহিত কার্যকারণ বিষয়ে গবেষণা এবং উদারনৈতিক রাজনীতিতে অবদান রাখার জন্য ১৯৯৮ সালে অর্থনৈতিক

নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে।

বিজ্ঞানে ‘ব্যাঙ্ক অফ সুইডেন পুরস্কার’ (অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার হিসেবে পরিচিত) লাভ করেন। ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইউনূস (জন্ম ১৯৪০) নোবেল পুরস্কার প্রাপক তৃতীয় বাঙালি। মুহাম্মদ ইউনূস এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যৌথভাবে ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত। বাঙালি তবে ভৌগোলিক ভূখণ্ডের পরিচিতিতে তিনি বাংলাদেশি। ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৬১)। নোবেল বিজয়ী তৃতীয় ভারতীয় বাঙালি। ‘বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি’র জন্যই তাঁর এই পুরস্কার পাওয়া। অভিজিৎ ছাড়া আরও দুই পুরস্কার প্রাপক অর্থনীতিবিদ— তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক এস্থার দুফলো ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল ক্রেমার। অমর্ত্য সেনের পর অর্থনীতিতে নোবেল পাওয়া দ্বিতীয় ভারতীয় বাঙালি এবং নোবেলজয়ী চতুর্থ বাঙালি। নোবেল কর্তৃপক্ষ বলেছেন: “The research conducted by this year’s Laureates has considerably improved our ability to fight global poverty. In just two decades, their new, experiment based approach has transformed development economics, which is now a flourishing field of research.”। অর্থাৎ এ-বছরের নোবেল বিজেতাদের গবেষণা দুনিয়াভর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের শক্তি বাড়িয়েছে। মাত্র দু-দশকে তাঁদের নতুন গবেষণাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের অর্থনীতিতে রূপান্তর এনেছে, যা বর্তমানে গবেষণার এক উদীয়মান ক্ষেত্র। নোবেল কমিটির মুখপাত্রের ব্যাখ্যায়: “এই অর্থনীতিবিদদের বৈশিষ্ট্য হল, উন্নয়ন অর্থনীতির সমস্যাগুলি নিয়ে, বিশেষ করে দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে তাঁরা সমস্যাজনক কোন নীতি কাজ করছে, কোন নীতি কাজ করেনি— অংশগুলিকেও ক্ষুদ্রতর অংশে ভেঙে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন।” নোবেলজয়ীদের কর্মপদ্ধতি গত তিন দশকে গবেষণায় যে বাস্তব পরিবর্তন এনেছে, তাতে বেশি লাভবান হয়েছে, বিশেষত ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও চীন প্রভৃতি দেশের অতি দরিদ্ররা। এঁরা মনে করেন, দারিদ্র্য কেবল অর্থের টানাটানি নয়, এটি এক বহুমাত্রিক সমস্যা। এর নিরসনে বহুস্তরীয় প্রকল্প জরুরি। কারণ, দুনিয়ার নানা ভূখণ্ডের গরিব মানুষ কি বলছে, কেমন আচরণ করছে, কীভাবে চিন্তা করছে— এসব ভাবনার ব্যাবহারিক গুরুত্ব উন্নয়ন অর্থনীতিতে খুব বেশি।

প্রতিভাবান মানুষদের ধারাবাহিক পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতা নিয়ে অসামান্য অজানা সব কাহিনি বড়ো কোনো সাফল্যের পর বেশি বেশি চর্চিত হয়। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে চলমান স্বাভাবিকতায় চরম সাফল্যেও খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না। দুনিয়ার সবচেয়ে লোভনীয়, সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার নোবেল জেতা নিঃসন্দেহে বিভিন্ন ক্ষেত্রের পথিকৃৎদের জন্য জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন। কিন্তু অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল জেতার পরমুহূর্তের অভিব্যক্তি ছিল বেশ ব্যতিক্রমী। নোবেল জেতার পরমানন্দের খবর ভোর বেলায় শুনেও তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কারণ, “সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে পড়ায় অভ্যস্ত নই। মনে হল, না ঘুমোলে শরীরের ওপর অত্যাচার করা হবে।” স্বাভাবিকভাবে অভিনন্দন জানিয়ে একের পর এক অনবরত ফোন আসতে থাকে। বেশিক্ষণ তাই ঘুমোতে পারেননি। তবে এই পুরস্কারটি তাঁর কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত।

তাই তিনি বলতে পেরেছেন, “ভেবেছিলাম কোনো প্রবীণ অর্থনীতিবিদ পাবেন। পঁয়ষট্টি বা সত্তরের পরই তো সাধারণত পান। আটান্ন বছরেই পাব, ভাবিনি। তবে স্বীকৃতি নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না। বিশ্বাস করতাম, একদিন পাবই। তবে এত তাড়াতাড়ি পাব, সত্যিই ভাবিনি।” অর্থনীতির দুনিয়ায় তাঁর থেকেও বেশি যোগ্য, অনেক বেশি সৃষ্টিশীল মানুষ রয়েছেন বলে মনে করছেন তিনি। এবং তাঁরাই এই পুরস্কারের আসল হকদার। ১৯৯৫-’৯৬ সাল থেকে তিনি অর্থনীতি নিয়ে গবেষণারত। নয়ের দশকের শেষের দিকে এস্থার যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গে তিনি বহুবার নানা জিনিস নিয়ে গবেষণা করেছেন। লিভার ফাউন্ডেশনের হয়ে বীরভূমে প্রচুর ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে ডা. অভিজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে প্রকল্প তৈরি করে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবকদের নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর ইচ্ছে ওঁদের প্রশিক্ষিত করে তোলা। তিনি পল গার্টলার ও মৈত্রীশ ঘটকের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার নিয়ে গবেষণা করেছেন। এস্থার রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের ফল নিয়ে গবেষণা করেছেন। এখনও গ্রামীণ এলাকায় কোয়াক ডাক্তার দিয়েই চলে নাগরিকদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও চিকিৎসা। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমি ওঁদের

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বদারিদ্র্য নিয়ে গবেষণার জন্য অধ্যাপক এস্থার দুফলো ও সেন্ধিল মুল্লাইনাথানের সঙ্গে ২০০৩ সালে আব্দুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই তাঁদের গবেষণারই স্বীকৃতি অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার।

সেলফ কোয়ালিফায়েড স্বাস্থ্য পরিষেবক বলি। এঁদের মধ্যে অনেকে আয়ুর্বেদ বা হোমিয়োপ্যাথি নিয়ে কোর্স করেছেন। আমি ২০০০ সাল থেকে এঁদের নিয়ে কাজ করছি। জানেন, ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ অসুস্থ হলে এঁদের কাছেই যান? ভুল ডাক্তারের কাছে যাওয়াটাও কিন্তু দারিদ্র্য।" তিনি মনে করেন, বিশ্বে দারিদ্র্য কোনো একটা সমস্যা নয়। সমস্যা বুঝে তবেই সমাধান সম্ভব।

বিষয় হিসেবে অর্থনীতি আমাদের সিলেবাসে মাধ্যমিক পর্যন্ত প্রায় অপরিচিত। বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতির বাইরের বিষয় অর্থনীতি, যেটি আমাদের রাজ্যে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরেও বেশ কম প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। পাঠযোগ্য বিষয় হিসেবে এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বাড়লেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'অর্থনীতি এক কঠিন সাবজেক্ট' ধারণা এখনও বেশ প্রবল। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার স্কুলে ও কোনো কোনো কলেজে এই বিষয়টি এখনও সহজলভ্য নয়। পাশাপাশি সংসারের আয়ব্যয়, ভোগ্যপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং মিডিয়ার প্রভাবে জিডিপি, মুদ্রাস্ফীতি, বিশেষ করে বাজেট শব্দের অনায়াস প্রবেশ ঘটেছে সব পরিবারেই। আজকাল যেকোনো দোকানে কোনোকিছু ক্রয় করতে গেলে বিক্রেতার মুখে প্রথম জিজ্ঞাসা— 'বাজেট কত?' কিন্তু অর্থনীতি বিষয়টা প্রকৃতপক্ষে কী? অর্থনীতিবিদ সুগত মারজিৎ বলেন, "অর্থনীতি মানুষের তথা সমাজের অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, সে-কারণেই অনেকে একে 'ইকনমিক সায়েন্স' বলেন। মানুষ, বা কোনো কোম্পানি, বা কোনো সরকার কীভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নির্ধারণ করে, কার্যকর করে, তার থেকে দশের বা দেশের কী লাভ, মাপতে হবে লাভ-লোকসানের বহর, মানুষের দারিদ্র্য ঘুচবে কীভাবে সব নিয়েই অর্থনীতির শিক্ষা।" অন্য ভাষায় আমরা বলতে পারি, অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা পণ্য এবং পরিষেবার উৎপাদন,

জে-প্যাল-এর প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ, এস্থার এবং মুল্লাইনাথান।

জে-প্যাল-এর পৃষ্ঠপোষক মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ জামিলের সঙ্গে।

সরবরাহ, বিনিময়, বিতরণ এবং ভোগ ও ভোক্তার আচরণ নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

অর্থনীতির জনক হিসেবে কথিত অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'-এ অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান আখ্যায়িত করে বলেন, 'Economics is Science of Wealth'। তাঁর সংজ্ঞার মূল বিষয়বস্তু হল সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ। অর্থনীতির সঙ্গে উন্নয়ন সরাসরি সম্পর্কিত হওয়ায় অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'জনসাধারণের সক্ষমতার নামই উন্নয়ন'। কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হল, এখন পর্যন্ত যে চার জন বাঙালি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত, তাঁদের তিন জনেরই বিষয় তথাকথিত কঠিন অর্থনীতি। মুহাম্মদ ইউনূস শান্তির জন্য নোবেল পেয়েছেন, কিন্তু তিনিও অর্থনীতির অধ্যাপক।

বেড়ে ওঠার গল্প

কবিগুরুর জন্মস্থল কলকাতার জোড়াসাঁকো। শান্তিনিকেতনে জন্মেছেন অমর্ত্য সেন। মুহাম্মদ ইউনূসের জন্মভূমি অখণ্ড বাংলার চট্টগ্রামের জোবরা গ্রাম। চার জন বাঙালি নোবেলজয়ীর মধ্যে বাংলা ভূখণ্ডের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছেন একমাত্র অধ্যাপক অভিজিৎ। বাঙালি অভিজিতের জন্মস্থল মারাঠাভূমি মুম্বাই। জন্মকাল, বাঙালির আবেগের তারিখ ২১ফেব্রুয়ারি। সাল ১৯৬১। বাবা অর্থনীতির প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩০-২০০৭) ছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান। মা নির্মলা পাটানকর (বন্দ্যোপাধ্যায়) সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সের অর্থনীতির শিক্ষক। নির্মলার জন্মভূমি মহারাষ্ট্র এবং সে-কারণে মায়ের আদরে অভিজিতের মধ্যনাম 'বিনায়ক'। প্রসঙ্গক্রমে নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "অভিজিৎ মারাঠি ভাষা বুঝতে পারে। বলতে পারে না। ওর জন্ম মুম্বাইতে। আমার বাপের বাড়ি মুম্বাইতে। তবে মহারাষ্ট্রে ও থাকেনি। আমিও গত ৬০ বছর কলকাতায় আছি। আমার জন্মও মুম্বাইতে। ওর দাদু-দিদিমা সকলেই মারা গেছেন। আমার ভাইও মারা গিয়েছে। পুণেতে আমার এক বোন রয়েছে। বছরে একবার সেখানে যাই। এ ছাড়া মহারাষ্ট্রের সঙ্গে আমার তেমন সম্পর্ক নেই।" অভিজিতের বাবা-মা উভয়েই লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর প্রাক্তনী এবং বাবা ডক্টরেট সেখান থেকেই। স্কুলজীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতার সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির স্নাতক। স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করেছেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

অর্থনীতির কিংবদন্তি অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরের গন্তব্যস্থল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৮ সালে সেখানে ‘এসেজ ইন ইনফর্মেশন ইকনমিক্স’ (‘Essays in Information Economics’)-এর ওপর পিএইচ.ডি. করেন। হার্ভার্ড ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর বর্তমানে এমআইটি-র ফোর্ড ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল প্রফেসর অব ইকনমিক্স পদে কর্মরত। বিশ্বদারিদ্র্য নিয়ে গবেষণার জন্য অধ্যাপক এস্থার দুফলো ও অধ্যাপক সেন্দিল মুল্লাইনাথানের সঙ্গে ২০০৩ সালে এমআইটি-তে আব্দুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব (J-PAL) প্রতিষ্ঠা করেন। জে-প্যাল ল্যাবে তাঁদের গবেষণারই স্বীকৃতি এ-বছরের অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার।

ছোটোবেলা থেকেই বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়, বিশেষ করে সাহিত্য ও কবিতার আগ্রাসী পাঠক অভিজিৎ। বইয়ের সঙ্গে ছেলের নিবিড় ভালোবাসার কথা জানিয়ে তাঁর মা বলেন, “অন্য মায়ের মতো আমিও আমার সন্তানের কৃতিত্বে খুশি। আমি শিহরিত।” নোবেল জয়ের খবর শুনে, ছেলেকে ফোনে বলেন, “তুই খুব ভালো করেছিস। তোর বাবা থাকলে খুশি হত।” চমকে ওঠার মতো ঘটনা অভিজিতের অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা ছিল নিছক দৈবযোগ। বিষয় হিসেবে অভিজিতের পছন্দ অর্থনীতি বেশ পরের ঘটনা। কলকাতার বি টি রোডের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট-এ তিনি গণিত নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। বাড়ি থেকে অনেক দূরের ওই প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন যাতায়াত তাঁর ভালো লাগত না। তাই ঘরের কাছাকাছি প্রতিষ্ঠানে যোগদানের সিদ্ধান্ত এবং সেভাবেই শুরু হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি অধ্যয়ন। উল্লেখ্য, তাঁর বিখ্যাত পূর্বসূরী অমর্ত্য সেনের আলমাম্যাটারও প্রেসিডেন্সি কলেজ। অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম ভারতীয় বাঙালি অমর্ত্য সেন অভিজিৎকে বাচ্চা বয়স থেকেই জানেন।

অল্প বয়স থেকেই অভিজিৎ গণিতে অত্যন্ত পটু। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার আগে গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধানে তাঁর দাদা দারুণ সহায়ক হত বলে জানালেন অভিজিতের অনুজ অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী, ক্লাস নিতে গিয়ে গণিতের কোনো জটিল সমস্যায় আটকে গেলে অধ্যাপক দীপকবাবুও পুত্রের শরণাপন্ন হতেন। গুরুগ্রামের এক বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিচালক অনিরুদ্ধ দাদার গণিতে দক্ষতার পাশাপাশি রন্ধনশিল্পের পটুত্ব নিয়েও দারুণ উচ্ছ্বসিত। স্মৃতি উসকে জানালেন, “হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচডি. করতে গিয়েই রান্নায় হাতেখড়ি দাদার। সেখানে সে অনুভব করল, তার যা খেতে ইচ্ছে করে তা পাচ্ছে না। সে-জন্য কিচেনে তার প্রবেশ। রান্নায় রয়েছে স্বাভাবিক নৈপুণ্য। রান্নার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই বিশ্বজনীন ও কসমোপলিটন।” কৌতুকস্বরে তাঁর বক্তব্য: “অভিজিৎ যেকোনোরকম খাবার তৈরি করতে সক্ষম। এই কারণেই আমি বলি যে পরের বার মাস্টার-শেফ প্রতিযোগিতা জয়ের চেষ্টা করা উচিত।” অনিরুদ্ধের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে স্কুলে পড়ার সময় পার্ক স্ট্রিটে এক রেস্টুরেন্ট দ্য স্কাই রুম-এ তাঁদের খেতে যাওয়ার গল্প। বাবার সঙ্গে সেই সময়ে তাঁদের মূল্যবান মুহূর্তগুলি কাটানোর কথাও স্মরণ করেন: “বাবা এমন ছিলেন না, যিনি আমাদের এটা করতে বা সেটা না করতে আদেশ দিতেন। কিন্তু আমরা যা করতে ইচ্ছুক সে-বিষয়ে তিনি পরামর্শ দিতেন এবং আমাদের দিয়েছিলেন স্বাধীনতা।” তিনি বলেন, “দাদা ও বাবা বাড়িতে বুদ্ধিদীপ্ত তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ত, তবে সেটি কখনো উত্তেজনাপ্রবণ হত না। এসব ছিল বেশ উপভোগ্য, রোমাঞ্চকর। বাবা সবসময় সকলের প্রতি দরদি-প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতেন। সবাই, বিশেষত ছাত্ররা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত ও ভালোবাসত।”

আব্দুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব (J-PAL)

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল প্রাপ্তির খবরে আব্দুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব, সংক্ষেপে জে-প্যাল-এর নাম আমরা সকলেই শুনেছি। কিন্তু সেই পরিসরে উক্ত প্রতিষ্ঠান নিয়ে পত্র-পত্রিকায় দ্বিতীয় কোনো বাক্য উচ্চারিত না-হওয়া বিস্ময়ের। কারণ, অভিজিৎ ও তাঁর স্ত্রী এস্থার উভয়েই ওই প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে ডাইরেক্টর। জে-প্যাল এক আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্র, যা দারিদ্র্য হ্রাসের জন্যে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা কার্যক্রম দীর্ঘ দিন ধরে চালিয়ে আসছে। ব্যাপক পরিসরে বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হয়েই তাঁরা তাঁদের নীতিমালা নির্ধারণ করেন।

জে-প্যাল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জটিল জিজ্ঞাসার জবাবে র‍্যান্ডমাইজড কনট্রোলড ট্রায়াল (আরসিটি) পরিচালনা করে থাকে। নতুন গবেষণা তৈরি, জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া এবং কার্যকর প্রোগ্রামগুলো আনুপাতিক হারে বাড়ানোর জন্য সরকার, এনজিও, দাতা ও অন্যদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হয়েছে। ২০১৮-এর হিসেবে জে-প্যাল সহযোগী সংগঠনগুলির গবেষণার দ্বারা কার্যকর বলে প্রমাণিত প্রকল্পের আনুপাতিক বৃদ্ধিতে দুনিয়ার ৪০ কোটি নাগরিক জড়িত।

১৯৪৫ সালে সৌদি ব্যবসায়ী শেখ আব্দুল লতিফ জামিল (১৯০৯-১৯৯৩) জেদ্দায় এক গ্যাস

শেখ আব্দুল লতিফ জামিল তখন তরুণ।

স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে তাঁদের পারিবারিক ব্যাবসা আব্দুল লতিফ জামিল (ALJ) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে বিবিধ ব্যবসায়ের সমাহারে এটি আন্তর্জাতিক বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। পরিবহণ, প্রকৌশল ও উৎপাদন, আর্থিক পরিষেবা, জমি ও রিয়েল এস্টেট, শক্তি ও পরিবেশগত পরিষেবা, ভোক্তা পণ্য, বিজ্ঞাপন এবং মিডিয়া প্রভৃতি ব্যবসায় নিয়োজিত এই গোষ্ঠী। মেনাত (MENAT, অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও তুরস্ক) অঞ্চল ছাড়াও, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া প্যাসিফিক, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা-সহ ছয়টি মহাদেশের তিরিশেরও বেশি দেশে এই ব্যাবসা সক্রিয়। ফোর্বস সাময়িকীর মতে, সৌদির জামিল ব্যবসায়ী পরিবার বিশ্বের চতুর্থতম ধনী পরিবার। ১৯৯৩-এ প্রয়াত হন প্রতিষ্ঠাতা শেখ আব্দুল লতিফ জামিল। পিতার মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠানের হাল ধরেন বর্তমান চেয়ারম্যান ও সিইও বড়োছেলে মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ জামিল।

২০০৩-এ এমআইটি-তে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব'। উদ্দেশ্য ছিল কৃষি, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে প্রশাসন ও শিক্ষাক্ষেত্রে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আরসিটি অবলম্বনে দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকরী পন্থার উদ্ভাবন। কাকতালীয়ভাবে ওই বছরই মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ জামিল এএলজে-র সামাজিক ও লোকহিত দায়বদ্ধতায় শুরু করেন কমিউনিটি জামিল। এর মাধ্যমে হাজার হাজার সুবিধাবঞ্চিত নাগরিককে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় সহায়তা করা হয়। পাশাপাশি 'বাব রিজক জামিল' প্রকল্পের মাধ্যমে চালু হয় জীবিকার মানোন্নয়ন ঘটানোর বাস্তবায়ন।

এমআইটি-র প্রাক্তন ছাত্র মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ জামিলের সঙ্গে তাঁর প্রিয় আলমাম্যাটার এমআইটি-র আন্তরিক ও সৃজনশীল সম্পর্ক বহু দিনের। জামিল এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৭৮ ব্যাচের সিভিল ও এনভাইরনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে স্নাতক। বর্তমানে এমআইটি কর্পোরেশনের আজীবন সদস্য ও সক্রিয় এমআইটি ভলান্টিয়ার। ২০০৬-এর ২৪ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অ্যালামনি লিডারশিপ কনফারেন্সে এমআইটি প্রাক্তনী সংসদের সর্বোচ্চ সম্মান The Bronze Beaver Award তিনি লাভ করেন। ব্যাবসার পাশাপাশি পিতার লোকহিত ভাবনাকে বহন ও ক্রমশ সমৃদ্ধ করতে তিনি প্রথম থেকে সক্রিয়। ১৯৯০-এর প্রথম দিকে তাঁর পিতার নামে স্কলারশিপ ফান্ড গঠন করেন। সৌদি আরব ও অন্য দেশের শিক্ষার্থীদের এই ফান্ড থেকে স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। এমআইটির ১৬০ জনের বেশি পড়ুয়ার শৈক্ষিক উচ্চাশাকে সফল করতে ১৯৯৪-এ তিনি শুরু করেন আবদুল লতিফ জামিল টয়োটা এনডাউড স্কলারশিপ ফান্ড। শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, নিজে ১৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেন। সেই ক্রমে ২০০৫-এ পভার্টি অ্যাকশন ল্যাবকে প্রফেসরশিপ, দুটি ফেলোশিপ এবং গবেষণা ও পাঠদানের উদ্দেশ্যে বিশাল আর্থিক উপহার প্রদান করেন। তাঁর পিতার নামে এই তিনটি বড়োসড়ো এনডাউডমেন্ট অর্জনের ফলে

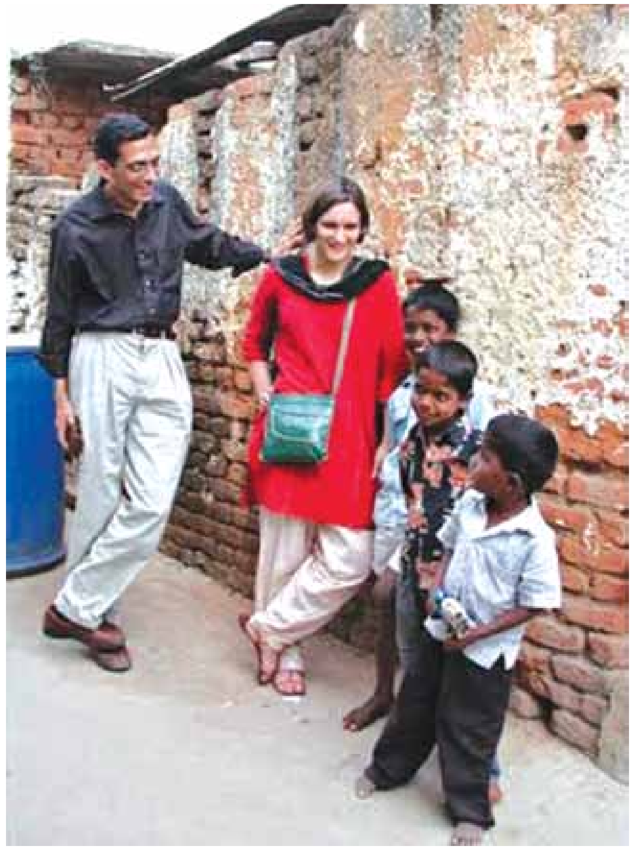

ঢুকে পড়েছেন দারিদ্র্যের সন্ধানে।

পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব-এর কাজের ক্ষেত্র ও গতি বৃদ্ধি পায়। এই শুভক্ষণে এমআইটি সভাপতি সুসান হোকফিল্ড বলেন, "এমআইটির প্রতি তাঁর অসাধারণ অঙ্গীকারের জন্য আমরা মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ জামিলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ। তাঁর সমর্থন দারিদ্র্যবিরোধী আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব-এর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য অর্জনের দুর্দান্ত সম্ভাবনা পূরণ করতে পারে।" হোকফিল্ড ঘোষণা করেন, "জামিলের পিতার নামে পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব-এর নামকরণের মাধ্যমে উদার উপহারটিকে এমআইটি চিহ্নিত করার পরিকল্পনা করেছে।" সেই সূত্রে তখন থেকেই শেখ আব্দুল লতিফ জামিলের নামে প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় আব্দুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব (জে-পিএএল)। এর কার্যক্রমকে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২০০৯-এ পুনরায় বেশ বড়ো অঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতা করেন জুনিয়র জামিল। জে-প্যাল ছাড়াও এমআইটির সঙ্গে আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান, আব্দুল লতিফ জামিল ওয়াটার অ্যান্ড ফুড সিস্টেমস ল্যাব (জে-ডব্লিউএএফএস), আব্দুল লতিফ জামিল ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ল্যাব (জে-ডব্লিউইএল) ও আব্দুল লতিফ জামিল ক্লিনিক ফর মেসিন লার্নিং ইন হেলথ (জে-ক্লিনিক) গড়ে তোলেন। এ ছাড়াও তিনি লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের সঙ্গে যৌথভাবে গড়ে তুলেছেন রোগের ঝুঁকির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের জন্য আব্দুল লতিফ জামিল ইনসটিটিউট ফর ডিজিজ অ্যান্ড ইমার্জেন্সি অ্যানালিটিক্স (জে-আইডিইএ)।

জে-প্যাল সারাদুনিয়ার মেধাবী অর্থনীতিবিদদের মগ্ন রেখেছে তাদের এই সংস্থার নানা গবেষণার

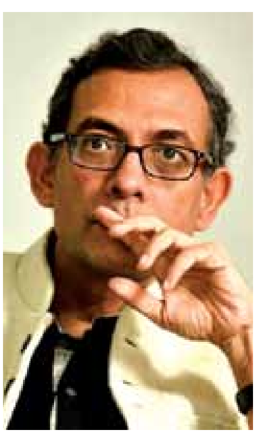

দাদুর জন্মভূমি মুম্বাইতে তাঁর জন্ম হলেও সেখানে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশি কাল থাকেননি। দক্ষিণ কলকাতার মহানির্বাণ রোডের বাড়িতেই শৈশব কাটিয়ে তাঁর বেড়ে ওঠা। বাড়ির পাশেই ছিল বস্তি। সেখানেই প্রথম পরিচয় দারিদ্র্যের সঙ্গে।

মা। দূরভাষে ছেলে-বউমার নোবেল জয়ে খুশি।

কাজে। প্রফেসর ব্যানার্জী, প্রফেসর দুফলো, প্রফেসর বেঞ্জামিন অলকেন, ইকবাল ধালিওয়াল প্রমুখর সঙ্গে ৪০-টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮০ জন গবেষক-প্রফেসর ৮১-টি দেশে প্রায় ৯৪৮-টি প্রকল্পের মূল্যায়নে যুক্ত আছেন। প্রায় ১৫০০ জনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি ও নিরূপণের ফল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি সফল হবে, মূলত তা নিয়েই তাঁদের বিজ্ঞানসিদ্ধ গবেষণা।

ভারত, কেনিয়া, পেরু ইত্যাদি দেশগুলোতে শিশুদের শিক্ষা, ভ্যাক্সিন কার্যক্রমের সফলতা নিয়ে তাঁরা কাজ করেছেন। ভারতে জে-প্যাল-এর তরফে বহু প্রকল্পের গবেষণা ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল, টিচিং অ্যাট দ্য রাইট লেভেল (প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের উন্নত শিক্ষা প্রদানকারী অসরকারি সংস্থা প্রথম [Pratham]-এর সঙ্গে যৌথভাবে), এ. পি. স্মার্ট কার্ডস (অন্ধ্রপ্রদেশ সামাজিক সুরক্ষা পেনশনের ওপর স্মার্ট কার্ডের প্রভাব), হরিয়ানা স্কুলস (শিক্ষার্থীরা যে-গ্রেডে রয়েছে, তার চেয়ে তাদের প্রকৃত শিক্ষার ব্যবধান), রাজস্থান পুলিশ (মিছিমিছি অভিযোগ জানানোর জন্য প্রলুব্ধকারীদের থানায় পাঠানো ও সেগুলির মূল্যায়ন করে পুলিশি ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের বিশ্লেষণ), দিল্লি ডিয়োর্মিং (Deworming) (শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২-৩ বছর বয়সি বাচ্চাদের আয়রন, ভিটামিন-এ পরিপূরক ও কৃমিনাশক ওষুধ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ওজন ও স্কুলের অংশগ্রহণ ব্যাপক বৃদ্ধি), উদয়পুর অ্যাবসেন্টস টিচার্স (আর্থিক উৎসাহ ও জরিমানায় শিক্ষকের উপস্থিতি বাড়িয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার উন্নতি), গুজরাত পলিউশন অডিটিং (নিজ ফার্মের পরিবর্তে শিল্প সংস্থাগুলির তৃতীয় পক্ষের দূষণ অডিটে উচ্চস্তরের দূষণ তথ্যের উদ্ঘাটন), নার্স অ্যাটেন্ডেন্স (নার্সদের উপস্থিতির মনিটর ও অনুপস্থিতির জন্য তাদের জরিমানার ফলে উপস্থিতির নাটকীয় উন্নতি) ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে জে-প্যাল-এর নোবেল না-পাওয়া বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। তথ্য বলছে, পুরস্কার শুরুর বছর ১৯০১ থেকে ২০১৯-তক মোট ২৭-বার ২৪-টি বিভিন্ন সংস্থাকে নোবেল দেওয়া হয়েছে। ইউএন এইচসিআর (UNHCR) ১৯৫৪ ও ১৯৮১ অর্থাৎ দু-বার এবং আইসিআরসি (ICRC) ১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ অর্থাৎ মোট তিন বার নোবেল পেয়েছে। উল্লেখ্য নোবেল প্রাপক সকল সংস্থা কেবলই শান্তি-র নোবেল পেয়েছে। যেমন, মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক উভয়ই ২০০৬-এ নোবেল শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত। তবে এ-অভিমতও প্রবল যে, ভবিষ্যতে জে-প্যাল গবেষকগণের অর্থনীতিতে নোবেল পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আছে। জে-প্যালের গবেষণা ও কার্যপ্রণালী নিয়ে বিল গেটসের মূল্যায়নও বেশ আকর্ষণীয়। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্থার দুফলোর 'পুয়োর ইকনমিক্স: এ র‍্যাডিক্যাল রিথিঙ্কিং অব দ্য ওয়ে টু ফাইট গ্লোবাল পভার্টি' বইয়ের পর্যালোচনায় তিনি লিখেছেন, "জে-প্যাল যে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রামাণিক তথ্য তৈরি করছে, সেটি সত্যসত্যই আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দারিদ্র্যবিরোধী প্রচেষ্টাকে আরও কার্যকরীরূপে এই তথ্য সহায়তা করতে পারে।"

আরসিটি: দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির ফল মূল্যায়নের পদ্ধতি

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/ পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"— সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) রচিত সামাজিক রূঢ় বাস্তবতার পরিচিত জনপ্রিয় কাব্যরূপ। ক্ষুধার্ত মানুষ সৌন্দর্যের নাগাল পান না। দারিদ্র্য যাঁদের নিত্যসঙ্গী, বুভুক্ষু মানুষের কাছে ক্ষুধার তীব্রতায় যেকোনো গোলাকার জিনিসই ঝলসানো রুটি। প্রকৃতির সমস্ত উপকরণের মধ্যে তখন তাঁরা খাদ্যই দেখতে পান। কলেজে পড়ার সময় নিরক্ষরতা দূরীকরণের এক কর্মশালায় ভুখা মানুষের জন্য সৌন্দর্যচর্চা না হলেও, অন্তত বই ধরার আহ্বান শুনেছি। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) 'দারিদ্র্য' নামের মস্ত বড়ো কবিতায় গাইলেন: "হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে ক'রেছ মহান!/ তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান/ কণ্টক-মুকুট শোভা! দিয়াছ, তাপস, অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;"। মনে হতে পারে তিনি দারিদ্র্যের প্রতি অনুরক্ত ও দারিদ্র্যকে মহিমান্বিত করেছেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই উপলব্ধ হয় দারিদ্র্যের বন্দনাগীতি নয়, বরং দারিদ্র্য যে কবিকে মহান করেছে তিনি সে-উচ্চারণই করেছেন।

কবির কবিত্বে দারিদ্র্যের কষাঘাত 'ঝলসানো রুটি' হোক বা সেটি কবিকে যতই 'মহান' করুক-না-কেন, দারিদ্র্য অবশ্যই বড়ো অভিশাপ। সত্য এটাই, দারিদ্র্য নির্মম বাস্তব। বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স (এমপিআই) অনুযায়ী পৃথিবীর

নোবেল জয়ের পর গড়িয়াহাটে আচমকা জনপরিবৃত।

১০৪-টি দেশের ১৩০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেন। এঁদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ মানুষের দারিদ্র্য কল্পনাতীত। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনযাপনের মান সমস্ত কিছুর মূল্যায়নভিত্তিক সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই গঠিত এই সূচক। এমপিআই সূচক অনুযায়ী ভারতে দারিদ্র্যের মাত্রা সে-সময় ৫৪.৭ শতাংশ থেকে কমে ২৭.৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দুনিয়াজুড়ে দারিদ্র্য কমানোর পদ্ধতিগত গবেষণায় অর্থনীতিতে নোবেল-জয়ী অভিজিৎ-এস্থার-ক্রেমার। দাদুর জন্মভূমি মুম্বাইয়ে তাঁর জন্ম হলেও, সেখানে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশি কাল থাকেননি। দক্ষিণ কলকাতার মহানির্বাণ রোডের বাড়িতেই শৈশব কাটিয়ে তাঁর বেড়ে ওঠা। তাঁদের বাড়ির পাশেই ছিল বস্তি। সেখানেই প্রথম পরিচয় দারিদ্র্যের সঙ্গে। প্রেম হয়েছিল কি না জানা নেই, তবে আঁচ করা যায় কিছু একটা নিশ্চিত হয়েছিল। কারণ, ছোটোবেলার এই কঠিন বাস্তবতা তাঁকে একটা কথা নিশ্চিতরূপেই শিখিয়েছিল, গরিবরা একেবারেই আর পাঁচ জন মানুষের মতো। দরিদ্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, উদ্‌বেগ, যুক্তি মানা ও না-মানা, ভাবনা, কষ্ট, পরিশ্রম কোনোটাই গরিব বলে অন্যদের চেয়ে আলাদা নয়। অন্যদের সঙ্গে গরিবদের মূল পার্থক্য অর্থ থাকা আর না-থাকায়। শৈশবের সেই স্মৃতিকে হাতিয়ার করে এমআইটি-র জে-প্যাল পরীক্ষাগারে তাঁরা নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় রত। উদ্দেশ্য ধরিত্রী থেকে দারিদ্র্য অপসারণ। নূন্যতম দারিদ্র্য-হ্রাস। এবং এ-কাজে তাঁদের গৃহীত পদ্ধতির চর্চিত নাম র‍্যান্ডমাইজড কনট্রোলড ট্রায়াল বা আরসিটি। বাংলা তর্জমায় 'যথেচ্ছ চয়ন নিয়ন্ত্রণ-নিরীক্ষা' বা 'অক্রম নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা' কিংবা ডা. অভিজিৎ চৌধুরী-র বয়ানে 'বিধিবন্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত, সমবিভাজিত নিরীক্ষণ পদ্ধতি'। তাঁদের নোবেলপ্রাপ্তির পরে আরসিটি-র চর্চা ও কৌতূহল দেখে মনে হওয়াও স্বাভাবিক, নিশ্চয় এটি অর্থনীতির তত্ত্ব বা নীতি। অথচ ইতিহাস অন্য কথা বলে। আরসিটি বহুকাল ধরে চলে আসা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধতি। ওষুধের কার্যকারিতা নির্ধারণের প্রায়োগিক গবেষণায় অনুসৃত অন্যতম নিরীক্ষাপ্রণালী। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে আরসিটি-কে উন্নয়ন অর্থনীতির মূলস্রোতে নিয়ে আসার কৃতিত্ব অভিজিৎদের।

দরিদ্রদের কাছেই দারিদ্র্য দূরীকরণের খোঁজ। উত্তর চব্বিশ পরগনা।

ইউনিসেফ (UNICEF)-এর ওয়েবসাইট আরসিটি নিয়ে জানাচ্ছে, "A randomized controlled trial (RCT) is an experimental form of impact evaluation in which the population receiving the programme or policy intervention is chosen at random from the eligible population, and a control group is also chosen at random from the same eligible population. It tests the extent to which specific, planned impacts are being achieved."। অর্থাৎ আরসিটি হল প্রভাব মূল্যায়নের এক পরীক্ষামূলক পদ্ধতি। প্রকল্প গ্রহণকারী বা কর্মসূচির আওতায় থাকা উপযুক্ত জনগোষ্ঠী থেকে অক্রমভাবে বেছে নেওয়া হয় ট্রিটমেন্ট গ্রুপে। পাশাপাশি একই প্রকৃতির মানুষদের অক্রমভাবে চয়ন করা হয় কনট্রোলড গ্রুপে। সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত প্রভাবগুলি কী পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেছে, এটি তা পরীক্ষা করে।

দেশি-বিদেশি কোম্পানির গবেষণাগারে উদ্ভাবিত নতুন ওষুধ বাজারজাত করার আগে প্রয়োগগত গুণাগুণ যাচাই করার পদ্ধতিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। দুই দলের মধ্যে প্রথম দলের অসুস্থদের ওষুধ প্রয়োগ করা এবং দ্বিতীয় দলের একইরকম রোগে অসুস্থদের ওষুধ প্রয়োগ করা হয় না। তবে তাঁদের দেওয়া হয় মন রাখার জন্য ওষুধ অর্থাৎ ঔষধকল্প বা প্ল্যাসিবো (placebo)। শিশুকালে মায়ের সঙ্গে, বিশেষ করে হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তারের কাছে গেলে আমরাও বহুবার প্ল্যাসিবো বা ডাক্তারবাবুর দেওয়া মিষ্টি গুলি খেয়েছি। রোগ নিরাময়ের বদলে শুধু সান্ত্বনার জন্য প্রদত্ত ঔষধকল্প শারীরবৃত্তীয় প্রভাবের (physiological effect) বদলে মনস্তাত্ত্বিক উপকার (phychological benefit) করে থাকে। এ-ক্ষেত্রে প্রথম দল ট্রিটমেন্ট এবং ওষুধ প্রয়োগহীন অপর দল কন্ট্রোল। কোন রোগী কোন দলে থাকবেন সেটি বাছাই করা হবে কোনো পূর্বশর্ত বা পছন্দ-অপছন্দ ছাড়াই, অর্থাৎ এলোমেলোভাবে। এই বাছাই প্রক্রিয়ার নামই র‍্যান্ডাম সিলেকশন। কিছুদিন পর উভয় দলের মধ্যে অবস্থার তুলনা করলে ফল জানা যায়। জানা যাবে প্রয়োগীকৃত ওষুধ আগেভাগেই নির্ধারিত ব্যাধি নিরাময়ের জন্য জরুরি কি না। মানবশরীরের মতো সমাজদেহের অসুস্থতা, দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঘাটতি ও অপূর্ণতা দূরীকরণেও আরসিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। একইরকম আর্থসামাজিক পরিবেশের কিছু অঞ্চল বেছে নিয়ে সেগুলোকে ট্রিটমেন্ট ও কন্ট্রোল গ্রুপে ভাগ করা হয়। কন্ট্রোল গ্রুপ পূর্বাবস্থায় থাকলেও ট্রিটমেন্ট গ্রুপে নতুন কোনো নীতির প্রয়োগ ঘটানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ট্রিটমেন্ট গ্রুপের পরিবর্ধন এবং পরিবর্তন ঘটলে, তার গুণগত মান ও হার পরিমাপ করা হয়। এর থেকেই বোঝা যায় ট্রিটমেন্ট গোষ্ঠীর ওপর ব্যবহৃত নতুন নীতির প্রায়োগিক সাফল্য। তবে সফলতার সঙ্গে আরসিটি করতে গেলে, ট্রিটমেন্ট-এর বিতরণ র‍্যান্ডাম হওয়া, উভয় গ্রুপকে ট্রায়ালের জন্য র‍্যান্ডামভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে উভয় গ্রুপ একই চরিত্রের হয় এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উভয় গ্রুপকে রাখতে হবে এমনভাবে, যাতে করে ট্রিটমেন্ট গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে কোনো প্রকার যোগাযোগ বা মিক্সিং না হয়।

অর্থনীতিতে আরসিটি-র সফল প্রয়োগ এক যুগান্তকারী ঘটনা। চলমান জীবনে

ত্রয়ী। ক্রেমার, এস্থার এবং অভিজিৎ।

আরসিটি-র প্রয়োগ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে মধ্যস্থতার মাধ্যমেই অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে এই পরীক্ষামূলক গবেষণা। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক গবেষণায় আরসিটি প্রয়োগের অগ্রদূত অবশ্যই অধ্যাপক মাইকেল ক্রেমার। তিনি ও অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড মিগুয়েল ১৯৯০-এর মাঝামাঝি কেনিয়াতে এই পদ্ধতি প্রথম প্রয়োগ করেন। লটারির মাধ্যমে স্কুলপড়ুয়াদের দুটি ভাগে ভাগ করেন। ট্রিটমেন্ট ভাগের প্রতিটি বাচ্চাকে কৃমির বড়ি খাওয়ানো হয় এবং কন্ট্রোল ভাগে ছিল কৃমির বড়ি না-খাওয়ানো বাচ্চারা। তবে তাদেরও এমন প্ল্যাসিবো বড়ি খাওয়ানো হয়, যা সকলেই বিশ্বাস করত কৃমির ওষুধ বলেই। সম্পূর্ণ এলোমেলোভাবে বাচ্চাদের নির্বাচন করা হয়। দেখা গেল, যে-গোষ্ঠী কৃমির ওষুধ সেবন করেছিল, অনুমানমতো তারা শুধু কম সংক্রমণে ভুগছে না, স্কুলে তাদের উপস্থিতি এবং ফলও ছিল ভালো। এক দশক পরে ট্রিটমেন্ট গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী, যারা কৃমির বড়ি খেয়েছিল, তারা কন্ট্রোল গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি উপার্জনে সক্ষম হয়। পরে ভারতে ওই একই ফিল্ড ট্রায়াল প্রয়োগ করেন এস্থার দুফলো ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধাপে ধাপে এভাবে ফিল্ড ট্রায়াল অন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পরীক্ষিত হতে থাকে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষুদ্রঋণ থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবায় টিকাকরণের প্রভাব— সবকিছুতেই আরসিটি-র প্রয়োগ করে দেখার চেষ্টা করা হয়। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আরসিটি-র দ্বারা নির্ধারিত উপযুক্ত নীতির প্রয়োগক্ষমতা দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

ভূতপূর্ব আইএএস জে-প্যালের নির্বাহী পরিচালক ইকবাল সিং ধালিওয়ালের মতে, তাঁদের গবেষণাপদ্ধতি অধিকতর উন্নত। কারণ, র‍্যান্ডমাইজড মূল্যায়নে দুটি মূল সুবিধা রয়েছে। প্রথম, এটি প্রকল্পের প্রকৃত প্রভাব জানার এক পদ্ধতি। মূল্যায়িত পরিবারগুলির অক্রম চয়ন ও পাশাপাশি তুলনা গোষ্ঠী থাকার ফলে আমরা নিশ্চিত করতে পারি, প্রকল্প গ্রহণকারী ও যাঁরা গ্রহণ করেন না, তাঁদের মধ্যে নিয়মানুগ কোনো পার্থক্য নেই। যেটুকু প্রাথমিক পার্থক্য দেখা যায়, তা কেবলই হস্তক্ষেপের ফল। উভয়ের তুলনা করে আমরা কর্মসূচির প্রভাব নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। দ্বিতীয়, গবেষকগণ অনুসন্ধানের নকশা তৈরি করতে সক্ষম, যেখান থেকে তাঁরা দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন, প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং নীরিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেশ বড়ো করা হয়, ফলে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তগুলি হয় নির্ভরযোগ্য।

কেন দরিদ্র এলাকার মানুষ স্বাভাবিকভাবে সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর বদলে তাদের কোথাও কাজে লাগিয়ে অর্থ পেতে আগ্রহী হন। জে-প্যালের গবেষকরা বলছেন, এই অভিভাবকদের কিছু অর্থ দিলে হয়তো তাঁরা তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবেন। কিন্তু তাঁরা এই পরামর্শ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং তাঁরা গবেষণায় নির্দিষ্ট এলাকা থেকে নমুনা ব্যক্তি বাছাই করে তাঁদের অর্থ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন যে, সেটি আসলে কাজ করছে কি না। আরসিটি-র উদাহরণ যতটা সংক্ষিপ্ত ও সহজ মনে হোক-না-কেন, বাস্তবে এটি এক দীর্ঘকালীন বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণাপদ্ধতি। গণিত, রাশিবিজ্ঞান, অর্থনীতির সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়ার ফলিত গবেষণা। বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ মুস্তাফিজুর রহমান বলছেন, এই গবেষকরা দেখার চেষ্টা করেছেন যে, কোন ধরনের শিক্ষা দরকার এবং কী করলে মানুষ তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা নেওয়ার জন্য স্কুলে পাঠাবেন। তাঁর মতে, "এ-বারের নোবেলজয়ী তিন অর্থনীতিবিদের কাজের বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা একটি কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করছেন এবং সেটি ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা বোঝার জন্য গবেষণার পদ্ধতিতে নতুনত্ব এনেছেন।"

কলকাতার ছেলে ও কলকাতার বউমা

প্রথম এশিয়াবাসী নোবেলজয়ীর শহর কলকাতা। এই শহরেই তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু করেন এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী নারী মাদার তেরেসা। মাদার, অর্থাৎ গঞ্জা অ্যাগ্নেস বোজাজিউ (১৯১০—১৯৯৭) জন্মেছেন তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যের আলবেনিয়া ভূখণ্ডের স্কপিয়ে শহরে। বর্তমানে এটি উত্তর মেসিডোনিয়ার রাজধানী শহর। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত মাদার সেখানেই কাটিয়েছেন। আলবেনিয়ান ভাষায় গঞ্জা-র অর্থ ফুলের কলি বা মুকুল। মাদারও ফুলের কলিসম পরিবার-পরিচয়হীন পথশিশুদের জন্য ১৯৫০-এ কলকাতায় গড়ে তোলেন লোকহিত প্রতিষ্ঠান দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি। মাত্র পাঁচ টাকা এবং দশ জনকে নিয়ে শুরু হয় তাঁর এই মানবিক অভিযান। শহর থেকে রাজ্য, দেশ ছাড়িয়ে বিদেশ, বর্তমানে মিশনারিজ অব চ্যারিটি ছড়িয়ে পড়েছে ১৩৯-টিরও বেশি রাষ্ট্রে। ২০১২-তে এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৪৫০০ সন্ন্যাসিনী। ব্যতিক্রমী লোকহিতৈষণার কার্যক্রমই ১৯৭৯-এ তাঁকে শান্তিতে নোবেল এনে দেয়।

১৯৭৯-এ মাদারের নোবেল জয়ের সময় কলকাতার বউমা এস্থার দুফলোর বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। তাঁর শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামী সকলেই অর্থনীতির শিক্ষক-গবেষক অর্থাৎ গোটা ব্যানার্জী পরিবারের কাজকারবার অর্থনীতি নিয়ে। ১৯৭২-এ প্যারিসে জন্মানো সেই পরিবারের পুত্রবধূ এস্থারও সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছেন। এস্থারের বাবা মাইকেল দুফলো গণিতের অধ্যাপক, মা ভায়োলিন দুফলো শিশু-চিকিৎসক। এস্থার ১৯৯৪-এ প্যারিসের একল নর্ম্যাল সুপিরিয়র থেকে ইতিহাস ও

তাঁদের মতে, দুনিয়া জুড়ে দারিদ্র্য কেবলই এক নিরাকার সমস্যা, এ-ভাবনাকে দূর করা দরকার। দারিদ্র্য প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলো বিযুক্ত সমস্যার ফল। অর্থনীতির দুনিয়ায় হামেশায় শোনা যায় 'দারিদ্র্যের ফাঁদ', কিন্তু সেই ফাঁদকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অভিজিৎ ও এস্থার নিয়েছেন অগ্রণী ভূমিকা।

অর্থনীতিতে ডিগ্রি অর্জন করেন। পরের বছরই প্যারিস স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর। ছোটো থেকেই ইতিহাসবিদ হওয়ার যদিও সুপ্ত ইচ্ছে ছিল তাঁর। মাঝে ১৯৯৩-এ মস্কোতে দশ মাস ফরাসি ভাষার অধ্যাপনাকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস ও রাজনীতি চর্চা করেছেন। মস্কোর প্রবাসজীবনই তরুণী এস্থারকে অর্থনীতির প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী করে তোলে। ১৯৯৯-এ এমআইটি থেকে অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা শেষ করেন। এবং সে-বছরই শুরু হয় এমআইটি-র অধ্যাপনা। রিসার্চ স্কলার থাকার সময়ই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বিশ্বঅর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করেন এস্থার। সমান্তরালে চলতে থাকে শিক্ষকতা ও গবেষণা। ইতিহাসবিদ হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পথ তৈরি হয় অর্থনীতিতেই। বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য, শিশুমৃত্যু, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অবনতি তাঁকে মুচড়ে দিত, সঙ্গো টানতও। ফলস্বরূপ বিশ্বে দারিদ্র্য দূরীকরণ নিয়ে তাঁদের অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বামী অভিজিতের সঙ্গো নোবেল পেয়েছেন তিনিও। এস্থার অর্থনীতিতে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নোবেল প্রাপক। অর্থনীতিতে একইসঙ্গো একই বছর স্বামী-স্ত্রীর যুগ্মভাবে নোবেল প্রাপ্তি ইতিহাসে এই প্রথম। ১৯০৩-এ পদার্থবিদ্যায় তেজস্ক্রিয়তার ওপর গবেষণায় স্বামী পিয়ের কুরির সঙ্গো নোবেল পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী মেরি কুরি। মূলত মাইক্রো-ইকনমিক্স নিয়েই গবেষণা এস্থারের। উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থসামাজিক অবস্থাও তাঁর গবেষণাপত্রের অন্যতম বিষয়। যার মধ্যে রয়েছে গার্হস্থ্য সমস্যা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাস্থ্য-সহ আরও অনেক কিছু।

কলকাতা ও কলকাতার মাদারের সঙ্গো এস্থারের প্রথম পরিচয় হয় খুব ছোটোবয়সে। মাত্র ৬ বছর বয়সে জেনেছিলেন মাদার তেরেসা ও কলকাতার কথা। তাঁর কল্পনায় ধরা দিয়েছিল দাবার বোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ঘুঁটির মতো গাদাগাদি ভিড় আর অগাধ দারিদ্র্য। মাদার তেরেসা নিয়ে এক কমিক বইয়ের সূত্রে কলকাতা, বিশেষ করে কলকাতার ঘন বসতির সঙ্গো দূর থেকেই হয়েছিল এই পরিচয়। একেক জন কলকাতাবাসীর জন্য নির্ধারিত মাত্র ১০ বর্গফুট জায়গা। শিশু এস্থারের মনে হয়েছে কলকাতা যেন এক বড়ো দাবার বোর্ড, যেখানে ৩ ফুট × ৩ ফুট বর্গক্ষেত্রের দাবার বোর্ডে শহরবাসী গাদাগাদি করে থাকে। তাঁর বিস্ময় এই পরিস্থিতিতে তাঁর কী করা উচিত। এমআইটি-র স্নাতক ছাত্রী তরুণী এস্থার সত্যি-সত্যিই ২৪ বছর বয়সে কলকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন। শহরে ঢোকার পথে ট্যাক্সির জানালা দিয়ে শহর দেখে তিনি কার্যত তাজ্জব বনে যান। যে-দিকেই তাকান সেখানে ফাঁকা জায়গা, গাছ, ঘাস ও ফুটপাথ। কমিক বইয়ের স্পষ্ট চিত্রায়িত দুর্দশা সব গেল কোথায়? সেরকম লোকজনও কোথায়?

যুগলে।

অভিজিৎকে কিন্তু কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি। শৈশব থেকেই জানতেন দারিদ্র্যের বাস কোথায়। তাঁদের বাড়ির পেছনে জীর্ণ কুটিরেই তাদের আস্তানা। তাঁর মনে হত ওইসব বাড়ির বাচ্চাদের হাতে খেলাধুলোর অফুরন্ত সময় এবং তারা যেকোনো খেলায় তাঁকে হারাতে সক্ষম। তাদের সঙ্গো মার্বেল খেলতে তিনি নীচে নামতেন। সেগুলো সবসময় শেষ তক বস্তির ছেলেদের প্যান্টের ছেড়া পকেটেই চলে যেত। মাঝে মাঝে বেশ ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়তেন তিনি।

‘পুয়োর ইকনমিক্স: এ র‍্যাডিক্যাল রিথিঙ্কিং অব দ্য ওয়ে টু ফাইট গ্লোবাল পভার্টি’ নামের জনপ্রিয় গ্রন্থের ভূমিকায় অভিজিৎ ও এস্থার ওপরের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন। বইটিতে তাঁরা তত্ত্বের চেয়ে বাস্তব তথ্য ও প্রচলিত আখ্যানের মধ্যেকার দূরত্ব দূর করার চেষ্টা করেছেন। দারিদ্র্য যতদিন আছে ততদিন দরিদ্রদের খোপে পুরে তাঁদের দেখার তাগিদও বহুদিন ধরে বর্তমান বলে তাঁদের অভিমত। সামাজিক তত্ত্বে ও সাহিত্যে তাদের অলস বা উদ্যোগী, মহৎ বা তস্করতুল্য, ক্রুদ্ধ বা অক্রিয়, অসহায় বা স্বাবলম্বী হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। এই মতামতগুলির সঙ্গো সামঞ্জস্য করে যে-কর্মসূচি রচিত হয় সেখানেও বেশ কিছু সাধারণ সূত্র বিদ্যমান: গরিবদের জন্য দরকার মুক্ত বাজার, মানবাধিকারকে যথেষ্ট পরিমাণে সুদৃঢ় করা, প্রথমে সংঘর্ষ-বিবাদ মোকাবিলা করা, দরিদ্রতম ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি অর্থ দেওয়া, বিদেশি সহায়তা উন্নয়নকে ধ্বংস করে, প্রভৃতি। এইসব বিবেচনায় সত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকলেও সাধারণ দরিদ্র মহিলা বা পুরুষের আশা ও সন্দেহ, সীমাবদ্ধতা ও আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও বিভ্রান্তির জন্য এই পরিসর দারুণ সংকুচিত। দরিদ্ররা যদি এ-ক্ষেত্রে একান্তই উপস্থিত হন তবে সেটি সাধারণত কিছু উৎসাহিত

অনুদান দারিদ্র্য কমাতে পারে কি না, এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষের তরজা মনে হয় শেষ হওয়ার নয়। কিন্তু তাঁরা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইথিয়োপিয়া, ঘানা, হন্ডুরাস, পেরু প্রভৃতি দেশের অতি দরিদ্রদের অনুদান এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রকল্প থেকে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এক বছর পর থেকে এইসব পরিবারের রোজগার তুলনায় বেড়েছে।

মা এবং মুখ্যমন্ত্রীর মাঝে।

উপাখ্যান বা ট্র্যাজিক পর্বের নাটকীয় ব্যক্তি হিসেবেই। জ্ঞানের উৎস হিসেবে নন, তাঁদের উপস্থাপন ঘটে প্রশংসিত বা করুণার পাত্র হিসেবেই। সেরকম মানুষ হিসেবেও নন, যাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা সম্ভব কিংবা তাঁরা কী ভাবেন বা চান বা কী করেন।

গ্রন্থকারদ্বয়ের বয়ানে এই গ্রন্থ, ‘‘Poor Economics is ultimately about what the lives and choices of the poor tell us about how to fight global poverty.’’। অর্থাৎ ‘পুয়োর ইকনমিক্স’ প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রের জীবন ও পছন্দ, যা আমাদের জানায় কীভাবে দুনিয়ার দারিদ্র্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব। উন্নয়ন অর্থনীতির প্রশ্নে তাঁরা একাধারে যেমন দরিদ্র মানুষের বাজারভিত্তিক ভাবনা তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি দারিদ্র্য দূর করার নতুন তত্ত্ব, মতবাদকে ব্যাখ্যাও করেছেন। তাঁদের মতে, দুনিয়াজুড়ে দারিদ্র্য কেবলই এক নিরাকার সমস্যা, এ-ভাবনাকে দূর করা দরকার। দারিদ্র্য প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলো বিযুক্ত সমস্যার ফল। অর্থনীতির দুনিয়ায় হামেশাই শোনা যায় ‘দারিদ্র্যের ফাঁদ’, কিন্তু সেই ফাঁদকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অভিজিৎ ও এস্থার নিয়েছেন অগ্রণী ভূমিকা। তাঁরা এই গ্রন্থে তত্ত্ব, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি বহু দেশের নির্দিষ্ট কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে পারস্পরিক আলাপের পরিসর তৈরি করেছেন।

সাংবাদিক-লেখক স্বাতী ভট্টাচার্য ও অভিজিতের ‘বিকল্প বিপ্লব: যেভাবে দারিদ্র্য কমানো সম্ভব’ নামের বাংলা ভাষার প্রবন্ধ সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে উভয় লেখকের একক নিবন্ধের পাশাপাশি বেশ কিছু যৌথ নিবন্ধ বর্তমান। ইংরেজিতে লেখা অভিজিতের নিবন্ধের তর্জমা করেছেন সহ-লেখিকা স্বাতী ভট্টাচার্য। একটু বড়ো ভূমিকার শেষাংশে তাঁরা শোনাচ্ছেন আশাবাদের কথা: “যেখানে মানুষ সজাগ ও সচেতন, যেখানে সে তার অধিকার বোঝে, ছুড়ে দেওয়া টুকরো কুড়িয়ে নেয় না, অপমান হজম করে না, যেখানে তারা নিপীড়ন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক হয়ে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম ও আগ্রহী, সেখানে গোটা ব্যবস্থাটা অনেক ভালো কাজ করে। যে-সমাজে এমনটা হবে বলেই ধরে নেওয়া চলে, তেমন সমাজ তৈরিতে সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে। সে-সত্যকে মেনে নিয়ে, তাকে সম্মান জানিয়েও বলতে হয়, যতদিন-না তেমন সমাজ তৈরি হচ্ছে, ততদিন গালে হাত দিয়ে বসে থাকা চলে না। দারিদ্র্য কমাতে যা করা যায়, তা করতে হবে। এখনই।”

অভিজিৎ রচিত নিবন্ধগুলির অনন্য অংশ উদ্ধৃতির মাধ্যমে দারিদ্র্য ও দরিদ্র নিয়ে তাঁর অভিনব চিন্তাচেতনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারি। শিক্ষা ব্যবস্থায় উপনিবেশ মানসিকতার প্রবল উপস্থিতি নিয়ে তাই তিনি লিখেছেন, “আমরা পড়াশোনায় যথেষ্ট ভালো না করলে, বা আচরণে যথেষ্ট সুবিধা না হলে, আমাদের শিক্ষকরা আমাদের সবার সামনে অপদস্থ করার জন্য বলতেন, স্কুল থেকে আধ কিলোমিটার দূরের ওই আইটিআই-তে পড়া লেখা রয়েছে আমাদের কপালে। এর পর আর কে সেখানে পড়তে চাইবে?” কর্মসংস্থানের প্রসারে তাঁর নিদান: “শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতের কাজের চাইতে নিজেকে ভালো মনে করার ইচ্ছেটা আমার অনেকটাই কমে যেত, যদি জানতাম যে তাঁরাও কাঠের কাজ বা সেলাইয়ের ফোঁড় তোলায় আমার ডাহা অপদার্থতা দেখেছে। অবশ্যই যদি-না শিক্ষকরা ‘ও কাজগুলো সময় নষ্ট’ বলে পুরো ব্যাপারটা কাঁচিয়ে দেন। সেটাই তাঁরা করেছিলেন, যখন আমাদের হায়ার সেকেন্ডারি পাঠ্যক্রমে ওয়ার্ক এডুকেশন ঢোকানো হল।”

শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তী কালের কর্মজীবনের সাফল্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন, “যে কখনও স্কুলে যায়নি, তার চাইতে চতুর্থ শ্রেণি অবধি পৌঁছোনো পড়ুয়া যতটা লাভবান হচ্ছে। সাধারণত অভিভাবকরা এই লাভকে তেমন পাত্তা দেন না। চতুর্থ শ্রেণি শেষ করার পর তো আর কোনো লোক দেখানো কাজ মেলে না। কিন্তু চাষবাস, দোকানদারি, যে কাজই করুক-না-কেন, লিখতে-পড়তে পারা, অঙ্ক কষতে পারা তাতে অনেকটা সাহায্য করে।” তাঁদের মতো অর্থনীতিবিদদের কাজের ক্ষেত্র যেহেতু কঠিন বাস্তবের ফলনির্ভর, বিশেষ করে উন্নয়ন অর্থনীতির তুলাদণ্ডে শিক্ষকদেরও সাফল্য ব্যর্থতা নিরূপণ করেন। কঠিন শোনালেও তাঁর অভিমত হল, “শিক্ষকদের বেতন যদি প্যারাটিচারদের বেতনের সমান করা হত, তা হলে মোট জাতীয় উৎপাদনের অন্তত ১ শতাংশ বাঁচত, যা গরিবদের ফিরিয়ে দেওয়া যেত।” অর্থনীতির নানা নিদানও যে অনেক সময় সমাজসম্পৃক্ত ইতিহাস-ঐতিহ্য-পরম্পরার ওপর নির্ভরশীল, সেটি নিয়ে তাঁর মত: “হয়তো সমস্যার একটা কারণ হল, আমরা ভর্তুকিকে ‘দান’ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। দান করার কাজটাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। যে গ্রহণ করল, সে তা নিয়ে কী করল, সে-প্রশ্নটা জরুরি নয়। তাই ভর্তুকিকে ‘ক্ষতিপূরণ’ হিসেবে চিন্তা করা যেতে পারে। আমরা যদি মনে করি যে বর্ণ, জাতি, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ইতিহাসে কিছু মানুষ যেভাবে বঞ্চিত হয়েছে, ভর্তুকি সেই ক্ষতির নিরসন করছে, তাহলে আমাদের আত্মম্ভরিতা একটু কমবে। আমরা চিন্তা করতে বাধ্য হব, প্রতিটি শিশুর সমান সুযোগ নিয়ে বড়ো হয়ে উঠতে পারার যে লক্ষ্য, তা বাস্তবিক ঘটছে কি না।”

অর্থনীতির কেতাবি তত্ত্বের বাইরে দারিদ্র্য দূরীকরণের অসংখ্য ছোটো ছোটো কার্যকরী অভিজ্ঞতার বিজ্ঞানভিত্তিক আরসিটি-র যে-ফল তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, তা বিস্মিত করলেও কঠিন বাস্তব।

অর্থনীতির কেতাবি তত্ত্বের বাইরে দারিদ্র্য দূরীকরণের অসংখ্য ছোটো ছোটো কার্যকরী অভিজ্ঞতার বিজ্ঞানভিত্তিক আরসিটি-র যে-ফল তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, তা বিস্মিত করলেও কঠিন বাস্তব। যৌথ রচনায় উভয় লেখক তাই জানাচ্ছেন: "আফ্রিকার দক্ষিণের যেসব দেশে গড়-আয় ভারতের চাইতে অনেক কম, সেখানেও শিশুদের পুষ্টি ভারতের শিশুদের চেয়ে অনেক ভালো। কী করে হয়? তার একটা কারণ এই যে, ভারতে সামান্য টাকাতেও নানা লোভনীয় জিনিস কেনা যায়। পাঁচ টাকা দশ টাকাতেই পাওয়া যায় প্লাস্টিকের চিরুনি, শ্যাম্পুর খুদে প্যাকেট, টিপের পাতা। ভারতের দেশ-জোড়া মস্ত বাজার রয়েছে, তাই অনেক কম দামি জিনিস তৈরি হয়, বিক্রি হয়। আফ্রিকার গরিব দেশগুলিতে এসব শখের জিনিস গরিবের নাগালের বাইরে। খাদ্যশস্য ছাড়া খুব কিছু গরিব মানুষ কিনতে পারেন না। তাঁদের চয়েস কম পুষ্টি বেশি।" অনুদান দারিদ্র্য কমাতে পারে কি না, এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষের তরজা মনে হয় শেষ হওয়ার নয়। কিন্তু তাঁরা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইথিয়োপিয়া, ঘানা, হন্ডুরাস, পেরু প্রভৃতি দেশের অতি দরিদ্রদের অনুদান এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রকল্প থেকে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এক বছর পর থেকে এইসব পরিবারের রোজগার তুলনায় বেড়েছে। সবচেয়ে বড়োকথা তিন-চার বছর পরেও এই উন্নতি বজায় রয়েছে। এরই মাঝে তাঁরা আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের উজ্জ্বল উদাহরণ তুলে ধরে জানাচ্ছেন, "অনুদান দিয়ে দারিদ্র্য কমানোর এই যে-মডেল, তার পথিকৃৎ কিন্তু বাংলাদেশ। সে-দেশের একটি অসরকারি সংস্থা (BRAC) গ্রামীণ বাংলাদেশের ৪০-টি এলাকায় অতি দরিদ্র, অক্ষরপরিচয়হীন মেয়েদের তাঁদের পছন্দের কাজের জন্য (ছাগল-মুরগি পালন, ছোটোখাটো মুদির দোকান) এককালীন টাকা দেন, সেই সঙ্গে প্রায় দু-বছরের প্রশিক্ষণ আর নজরদারি চলে। ২০০৭ সালে শুরু এই প্রকল্পের বেশ কয়েক বার মূল্যায়ন হয়েছে। তাতে কেবল যে বাড়তি রোজগার (৩৮ শতাংশ) ধরা পড়েছে, তা-ই নয়। দেখা যাচ্ছে, এই মেয়েদের জীবনযাত্রাও বদলেছে। এলাকার মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির কাছাকাছি তাঁদের জীবনশৈলী।"

১৯৯৫-১৯৯৬ সাল থেকে অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজিৎ বলেন, "বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২০ বছর ধরে এই গবেষণার কাজ করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, কানাডায় কাজ করছি। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও গবেষণার কাজে যুক্ত করেছি। এই বাংলাতেই কেটেছে আমার ছেলেবেলা। এখানেই পড়াশোনা। মূলত বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস আমার গবেষণার কাজে অনেকটাই সাহায্য করেছে।" সন্তানের কাছে তাঁর পিতা-মাতাই প্রথম শিক্ষক হলেও অভিজিতের জন্য এটি দু-ভাবেই সত্য। নোবেল পেয়েও তাই তিনি বলতে পারেন, "মা-বাবাই আমার প্রথম শিক্ষক। তাঁদের অনুপ্রেরণায় আমি সফল হয়েছি। ... এত তাড়াতাড়ি নোবেল পাব,

অভিজিৎকে কিন্তু কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি। শৈশব থেকেই জানতেন, দারিদ্র্যের বাস কোথায়। তাঁদের বাড়ির পেছনে জীর্ণ কুটিরেই তাদের আস্তানা। 'পুয়োর ইকনমিক্স : এ র‍্যাডিক্যাল রিথিংকিং অফ দ্য ওয়ে টু ফাইট গ্লোবাল পভার্টি' নামের জনপ্রিয় গ্রন্থের ভূমিকায় অভিজিৎ ও এস্থার ওপরের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন।

নবীন ও প্রবীণ।

ভাবিনি। কারণ, নোবেল তো প্রবীণ অর্থনীতিবিদেরা পেয়ে থাকেন।" আর তাঁর মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওর বাবা বেঁচে নেই। তিনি জেনেও যেতে পারলেন না, তাঁর ছেলে নোবেল পেয়েছে। পেয়েছে তাঁর পুত্রবধূও। এই কষ্টটাই আজ আমার কাছে পীড়াদায়ক।" অর্থনীতির প্রশ্নে তাঁদের বউমা এস্থারও কিন্তু কম যান না। এস্থারের মতে, "দারিদ্র্য প্রায় সময়ই কমে যেতে দেখা যায় নানা তত্ত্বকথায়। এমনকী অনেকে সত্যি-সত্যিই দারিদ্র্য কমাতে চাইলেও তাঁরা জানেন না এই সমস্যার মূল কোথায়। দারিদ্র্যের এই শেকড় খুঁজে পেতেই শুরু হয় আমাদের গবেষণা।" তিনি আরও বলেন, "আমরা আমাদের উপায়ে যা করি তা হল— প্রত্যেকটি সমস্যাকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে এগুলোকে যতটুকু সম্ভব অক্ষরে অক্ষরে সমাধান করার চেষ্টা করি।"

নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর এস্থার দুফলোকে সাংবাদিকরা অর্থনীতি নয়, সরাসরি অর্থ নিয়েই জিজ্ঞাসা করে বসেন: "পুরস্কারের অর্থ আপনারা কীভাবে ব্যয় করবেন?" উত্তরে এস্থার জানান, "ছোটোবেলায় পড়েছিলাম, নোবেল-বিজয়ী প্রথম নারী মেরি কুরি তাঁর পুরস্কারের অর্থ দিয়ে এক গ্রাম রেডিয়াম উপাদান কিনেছিলেন। আমাদের সেই এক গ্রাম রেডিয়াম কী হবে, তা ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেব।" সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন অভিজিৎ। মেধাবী ছাত্রের হাতের লেখা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন ছিলেন গণিতের শিক্ষিকা দীপালি সেনগুপ্ত। হাতের লেখার জন্য বোর্ডের পরীক্ষায় তাঁর ছাত্র পাছে কম নম্বর না পেয়ে যায়, সে-কারণে তিনি অভিভাবককে স্কুলে ডেকেছিলেন। ছাত্রের নোবেল প্রাপ্তির খবরে সেই স্মৃতি তাজা করে তিনি বলেন, "ভালো ছাত্র ছিল। তবে হাতের লেখা ভালো ছিল না। হাতের লেখার জন্য ওর মাকে ডেকে পাঠাই। বলেছিলাম, লেখাটা ভালো করলে ওর রেজাল্ট আরও ভালো হবে। তবে সেদিন ওর মাকে ডেকে পাঠানোর কথা মনে পড়ে গেলে এখন কিছুটা লজ্জা পাই।" 'কিছুটা লজ্জা' নয়, শিক্ষিকা হিসেবে ছাত্রের এই বিশ্ববিজয়ে গর্ব ও খুশিই প্রাপ্য! তাই নয় কি!

তথ্যসূত্র:

১. অভিজিৎ ভি. ব্যানার্জি ও এস্থার দুফলো, 'পুয়োর ইকনমিক্স: এ র‍্যাডিক্যাল রিথিঙ্কিং অব দ্য ওয়ে টু ফাইট গ্লোবাল পভার্টি', পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, ইউএসএ, ২০১১।

২. অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাতী ভট্টাচার্য, 'বিকল্প বিপ্লব: যেভাবে দারিদ্র্য কমানো সম্ভব', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৯।

৩. 'দেশ' (২ নভেম্বর ২০১৯), 'আরেক রকম' (১-১৫ নভেম্বর ও ১৬-৩০ নভেম্বর ২০১৯), 'সৃষ্টির একুশ শতক' (নভেম্বর ২০১৯), 'OPEN' (১৮ অক্টোবর ২০১৯) এবং আরও বেশ কিছু মুদ্রিত ও অনলাইন পত্রপত্রিকা। ■

সাহিত্যের সব ক-টি অলিন্দে তাঁর যাতায়াত ছিল উচ্চ মননশীলতার আবহে পূর্ণ। ফিল্মেও তিনি ছিলেন সমান স্বচ্ছন্দ, বহুপ্রশংসিত। এমনই সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি জগৎকে দেখার চোখ ছিল প্রখর যুক্তিপূর্ণ। প্রবল বনাম দুর্বলের ক্ষেত্রে সবসময় তিনি জানার চেষ্টা করেছেন দুর্বল কেন দুর্বল। থেকেছেন সত্যেরই পক্ষে। এমন মানুষকে আমরা অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জানাই।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

প্রগতির ক্লান্তিহীন পথিক

বুলবুল আহমেদ

কেউ কেউ তো এমন মানুষ থাকেন, যাঁরা নানা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক সংকটে বন্ধুর মতো আত্মীয়ের মতো প্রিয়জনের পাশে এসে বসেন। একটা ভরসার হাত বাড়িয়ে দেন। নিরাময়ের পথ দেখান। সঙ্গে করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন উত্তরণের দিকে। আমাদের যাবতীয় দ্বেষ ও ব্যর্থতা ধারণ করে নীলকণ্ঠ হন। সুরজিৎ দাশগুপ্ত সেরকম একজন মানুষ ছিলেন। সহনাগরিকদের মধ্যে শেষ ঋষিকল্প মানুষ বলেই মনে হয় তাঁকে। আপামর বাঙালি তাঁকে মনে রাখবে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রবক্তা হিসেবে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একজন সহৃদয় ও নিরলস কর্মী হিসেবে। ইতিহাসের একজন মোহহীন গবেষক হিসেবে। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার একটি দীপ্তিমান শিখা হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, শিবনারায়ণ রায়, কাজী আবদুল ওদুদ, নজরুল, রোকেয়া, অম্লান দত্ত বা হুমায়ুন কবীর যে-সমাজের কথা, সহাবস্থানের কথা ভাবতেন, সুরজিৎ দাশগুপ্তও সেই সামাজিক জীবনযাপনের চেষ্টা করেছেন কর্ম ও কথার সত্য আত্মীয়তায়।

জলপাইগুড়ি, শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় পরিব্যাপ্ত তাঁর ছিয়াশি বছরের জীবন। শুরু ১৯৩৪ সালে এবং শেষ ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের এক তারিখে। তাঁর যাপনকথা না-আসা সময়ের নাগরিকদের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে, পথ দেখাবে এক স্থির প্রত্যয়ে। ছোটোবেলার কথাচারণায় বার বার উঠে আসে জলপাইগুড়ি শহর, জ্যাকসন মেডিকেল স্কুল। তাঁর মা অশ্রুকণা দাশগুপ্ত এই মেডিকেল স্কুলের প্রথম মহিলা ডাক্তার। লেডি ডাক্তার বলে জানতেন শহরের সকলে। যে কেউ পৌঁছে দিতে পারতেন নির্দিষ্ট ঠিকানায়। মা অশ্রুকণা বেড়ে উঠেছেন ঢাকা শহরের একটি সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকা পরিবারে। অত্যন্ত প্রগতিশীল ও উদার ব্রাহ্ম পরিমণ্ডল ছিল সেখানে। পরবর্তী সময়ে তা ছাপ রেখে যাবে সুরজিৎ দাশগুপ্তের জীবনে, মায়ের

থেকে উৎসারিত হয়ে। তাঁর লেখা থেকে ব্যক্তিগত কথা থেকে জেনেছি মায়ের মেডিকেল স্কুলের কোয়ার্টারের পাশে ছিল দরিদ্র মুসলমানদের এক বস্তি এলাকা। সামান্য দূরেই বয়ে চলেছে তিস্তা। ধরধরা ও করলা নদী ঘেরা জনপদে তিনি বেড়ে উঠেছেন। মুসলমান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর খেলাধুলা, স্নান ও সাঁতারে বয়ে গেছে সময়। পরবর্তী সময়ে মুসলমান সমাজের পাশে থাকার পাঠ নিয়েছেন এই মেলামেশা ও উদার পারিবারিক আবহ থেকে, মনে হয়। আর কৈশোর উত্তীর্ণ একটা দীর্ঘ সময় কেটেছে শান্তিনিকেতনে অন্নদাশঙ্কর রায় ও লীলা রায়ের সান্নিধ্যে। এবং তা তাঁকে জীবন-জগৎ-সমাজকে অন্যভাবে জানার ও বোঝার এক গভীর অনুভূতিশীল মন তৈরিতে সহযোগিতা করেছে। তখনকার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ না থাকলেও তাঁর যাপিত উদারতার রেশ ছড়িয়ে রয়েছে সবখানে, তখনও। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ নেবার সময় থেকে সাহচর্য পেয়েছেন জীবনানন্দ দাশ, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এইসব বুধজনের।

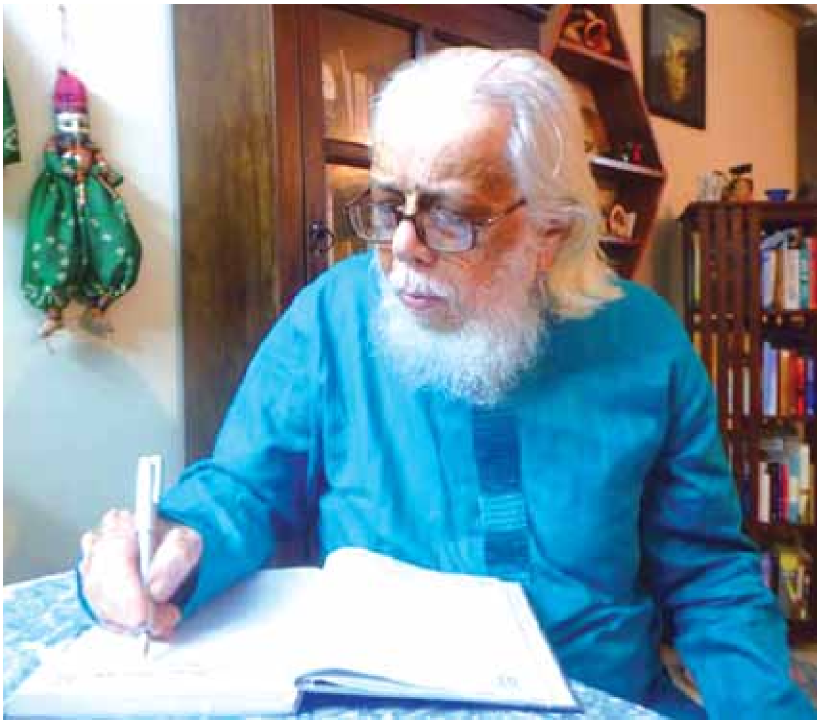

আমৃত্যু ছিলেন সৃষ্টিকাজে নিমগ্ন।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত কবিতা লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা কম করে ছয়খানা। শিশু-কিশোরদের জন্য সাহিত্য রচনা করেছেন। সুনীতিকুমার-শিবরাম-অন নদাশঙ্করের জীবনী লিখেছেন। চলচ্চিত্র তাঁর অন্যতম প্যাশন ছিল। সিনেমা ও তথ্যচিত্র পরিচালনা করে খ্যাতি পেয়েছেন। তবে তাঁর সমধিক পরিচিতি একজন মানবতাবাদী ও যুক্তিশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে। তাঁর প্রবন্ধের বইগুলির মধ্যে রয়েছে 'দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ', 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম', 'মৌলবাদ: এক নতুন সংজ্ঞা', 'প্রসঙ্গ: সাম্প্রদায়িকতা', 'ভাসকো-ডা-গামার পাঁচশো বছর', 'রামমোহন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা', 'ভারতীয় মুসলমানের সংকট', 'ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর', 'রেনেসাঁস: বিশ্বায়নের সূচনা', 'মৌলবাদ ও সমকাল' এ ছাড়াও নানা পত্রপত্রিকা ও সংকলনে ছড়িয়ে থাকা অগ্রন্থিত অনেক প্রবন্ধ তাঁর মানস-প্রবণতা ধরে রেখেছে এবং তা আগামী দিনের পাঠকদের ভাবনার খোরাক জোগাবে নিশ্চয়। তবে বিস্মৃতিপরায়ণ বাঙালির প্রতি অধিক আস্থা রাখা দুরাশা।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' পড়েন শান্তিনিকেতনে থাকতে। গ্যেটের 'ফাউস্ট' পড়া হয় ওখানে। তারপর জার্মান ভাষা শেখেন। আর জীবনানন্দ দাশের উপদেশে পড়েন আধুনিক ইংরেজি

জলপাইগুড়ি, শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় পরিব্যাপ্ত তাঁর ছিয়াশি বছরের জীবন। শুরু ১৯৩৪ সালে এবং শেষ ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের এক তারিখে। তাঁর যাপনকথা না-আসা সময়ের নাগরিকদের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে, পথ দেখাবে এক স্থির প্রত্যয়ে।

সাহিত্যের জয়েস প্রমুখের লেখা। শান্তিনিকেতনে থাকতেই তিনি দান্তে, গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ তিন ভাষার তিন মহাকবিকে নিয়ে একটা বই লেখার পরিকল্পনা করেন। তারই ফসল 'দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ' বইটি। জয়েসও তাঁর প্রিয়। 'পোর্ট্রেট অফ অ্যান আর্টিস্ট', 'ইউলিসিস' পড়ে মুগ্ধ হন এবং পাঠ-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় প্রবন্ধে এবং তা সংকলিত প্রবন্ধ-সংকলনে। 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' প্রকাশিত ১৯৯১ সালে, যদিও এর পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন দার্জিলিঙে থাকতে। বলা চলে রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি ইসলাম-বিদ্বেষের প্রতিবাদে। ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিন্যাসে ইসলাম এক অমোচনীয় প্রভাব রেখেছে। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ব্রিটিশের কৃপাধন্য ঐতিহাসিকরা নানাভাবে তা খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন বার বার। আর এটা তো ঠিক যে, একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি তার ইতিহাস বিকৃত করে দেখানো বা তা ভুলিয়ে দেওয়া। আমরা দেখেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন— বাংলায় মুসলমান প্রভাব বলতে পাঁচ/ছয়টি আরবি-ফারসি শব্দ ছাড়া আর-কিছু নেই। এর থেকে ভয়ংকর মিথ্যাচার আর হতে পারে না। সেই পরম্পরা আজও চলেছে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতর প্রসঙ্গে। দার্জিলিঙে রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে দেখা হলে তিনি এক দীর্ঘ তর্কে জড়িয়ে পড়েন। বেলা গড়িয়ে যাওয়া সেই তর্ক প্রায় মিথ হয়ে আছে, সে-দিন যাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁদের কাছে। এই গ্রন্থে সুরজিৎ দাশগুপ্ত ভারতবর্ষে মুসলমান আগমন ও সমাজজীবনে তার প্রভাব ও কারণ বিষয়ে অনেক নতুন, কিন্তু যৌক্তিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন প্রমাণসহ। ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা বিস্তার প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "ব্যাপারটা বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে যে, যখন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের হাতে সত্যিই অনেক শক্তি ছিল, তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় লঘু ছিল।" প্রায় সাতশো বছর ধরে মুসলমানরা দিল্লি থেকে ভারতবর্ষ শাসন করলেও খোদ দিল্লি কোনোদিনও মুসলমানপ্রধান হয়নি।

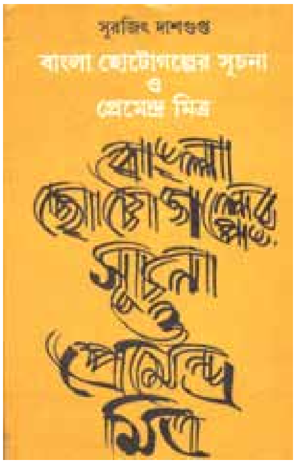

অথচ ক্ষমতায় থাকার দৌলতে তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার কথা ছিল। তবুও অস্ত্রের জোরে ইসলাম প্রচারের কুনাট্য আজও গেল না। তিনি লক্ষ করেছেন, "যখন বাংলার শহর-এলাকায় হিন্দুরা এক নতুন উত্থান ও জাগরণের চেতনায় ও গৌরবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, এই ঘটনাকালেই গ্রামাঞ্চলে বাঙালি মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার গৌরব অর্জন করে।" বলপ্রয়োগে ইসলাম প্রচারের তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, "প্রথমেই আসে বলপ্রয়োগে ধর্ম প্রচারের তাৎপর্য ও তা হৃদয়ঙ্গমের প্রশ্ন। যদি অস্ত্রের সাহায্যেই বা বলপ্রয়োগেই ইসলাম ধর্ম প্রচার হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র থেকে এত দূরে বাংলাতেই ইসলাম ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করল কী করে? বলপ্রয়োগে ধর্মপ্রচারের তত্ত্ব সত্য হলে মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র দিল্লির সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে ইসলামের অধিকতর প্রতিষ্ঠা হওয়াই উচিত ছিল না কি? বাংলার ক্ষেত্রে গৌড় ও ঢাকার শহরাঞ্চলেই ইসলামের জনপ্রিয় হওয়ার কথা নয় কি? কিন্তু কার্যত তা হয়নি। অনেকে মনে করেন, নবাব-সুলতানদের দরবারে ও দপ্তরে উচ্চপদ পাওয়ার লোভেই জনসাধারণের একটা অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এটাই যদি সত্যি হয়, তাহলে দিল্লির সংলগ্ন অঞ্চলেই মুসলিমদের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত ছিল, কেননা সেখানেই উচ্চপদের সংখ্যা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সুতরাং উচ্চপদের প্রলোভন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ হতে পারে না।" এমন কথা সৈয়দ মুজতবা আলীও লিখেছেন তাঁর 'ভবঘুরে ও অন্যান্য' বইয়ের 'বাংলাদেশ' নামের প্রবন্ধে, তবে অনেক সরস ভঙ্গিতে। ইতিবাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিপরীতে গিয়ে সুরজিৎ দাশগুপ্ত লেখেন, "নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণের অত্যাচার থেকে অব্যাহতির আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু নেতারা নিজেদের ধর্মকে যতটা উদার বলে প্রচার করেন, হিন্দু ধর্ম যে সত্যই ততটা উদার নয়, এর উদারতা বহুলাংশে প্রচারসর্বস্ব, তার প্রমাণ নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের আচরণেই মেলে।" ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত তাঁর 'বিষয় ইতিহাস এবং অন্যান্য বিষয়' বইতে একটি হিন্দুধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন— বর্ণভেদ বাদ দিলে হিন্দুধর্মের আর-কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যেন আমরা সুরজিৎ দাশগুপ্তরই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আর ক্ষিতিমোহন সেন 'জাতিভেদ' গ্রন্থে হিন্দুধর্মের বর্ণ-কেন্দ্রিক আচার ও নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন, যা ভাবলে আজকেও শিউরে উঠতে হয়। তা ছাড়া নানান কুসংস্কার চালু রয়েছে ধর্মের নামে।

অনেকেই বাংলায় ইসলামের আগমনের সঙ্গে তুর্কি বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের ঘটনা গুলিয়ে ফেলেন। ভুলে যান বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসারে সুফি-সাধকদের মরমি অবদানের কথা। তাঁরা ভুলে যান যে, শাসকরূপে আসার আগে এখানে মুসলমানরা আসেন বণিক-বেশে এবং তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিনা বেতনের মিশনারি। রিচার্ড এম ইটনের 'Rise of Islam in Bengal Frontier' বইতে এর অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত জানালেন, "আরব বণিকরা বা মূলত শেখ সম্প্রদায় যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজ্য জয়ের চেয়ে বাণিজ্যিক তৎপরতায় অধিক আগ্রহী ছিল। তারা যেমন আরব সাগরবর্তী বিভিন্ন ভারতীয় বন্দর ও সিংহলে পত্তনি পেতেছিল, তেমনই বঙ্গোপসাগর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে ঘাঁটি গড়ে তোলে। আস্তে আস্তে হিন্দু বণিকদের কাছে আরব বণিকরা স্বীকৃতি পেল। সমাজপতিদের ভয়ে যারা ঘরের কোণে জীবনমৃত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছিল, তাদের ওই আরবরা ডাকল সমুদ্রে, আশ্বাস দিল, সাহস দিল, জোগাল নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণা। দিল নতুন ধর্মের আশ্রয়, দিল আত্মবিস্তার ও আত্মবিশ্বাসের অধিকার, সামাজিক স্বীকৃতি ও সক্ষমতার প্রতিশ্রুতি। যাদের রক্তে ছিল পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সমুদ্রের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, তারা পরম উৎসাহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল কাতারে কাতারে।" বলা প্রয়োজন সে-সময় একজন হিন্দু অন্যদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে ধর্মচ্যুত হত তার অনিচ্ছা থাকলেও। মনে রাখা দরকার, পদ্মার এপারের মুসলমানদের মধ্যে তুর্কি, আফগান, পাঠান ও মুঘল রক্ত যতটা মিশেছে, পূর্ব পারের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ততটা হয়নি। সেখানে আরব বণিকরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি, রাজত্ব করেনি। বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেও কম। তুর্কিরা যখন বাংলায় এল, তাদের তেমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মুখোমুখী হতে হয়নি। সাধারণ মানুষের কাছে ততদিনে ইসলামের সামাজিক সাম্যের মর্মবাণী পৌঁছে গেছে।

'প্রসঙ্গ: সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থে সুরজিৎ দাশগুপ্তের দৃষ্টি পড়েছে ভারত উপমহাদেশের আরেক গভীর গভীরতর ব্যাধির দিকে, যার নাম সাম্প্রদায়িকতা, যার নাগপাশ থেকে আজও আমাদের মুক্তি ঘটেনি। এ-দেশে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদাভেদ ও বিদ্বেষ নিয়ে লেখালেখি, আলোচনা ও কথাবার্তা কম হয়নি। তা নিরসনের চেষ্টাও কম হয়নি। সেতু-বাঁধার কাজে রেজাউল করিম ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো

'প্রসঙ্গ: সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থে সুরজিৎ দাশগুপ্তের দৃষ্টি পড়েছে ভারত উপমহাদেশের আরেক গভীর গভীরতর ব্যাধির দিকে, যার নাম সাম্প্রদায়িকতা, যার নাগপাশ থেকে আজও আমাদের মুক্তি ঘটেনি। এ-দেশে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদাভেদ ও বিদ্বেষ নিয়ে লেখালেখি, আলোচনা ও কথাবার্তা কম হয়নি। তা নিরসনের চেষ্টাও কম হয়নি।

মানুষেরা অনেক শ্রম দিয়েছেন। কিন্তু আঁধার গেল না এখনও। বাংলার সহজিয়া সাধকেরা আন্তরিক আহ্বান জানালেও অবিশ্বাস ও অপরিচয় আজও পাহাড়প্রমাণ। বাংলায় হয়তো বড়ো রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি, তবে আমরা পরস্পরের অবস্থান সম্পর্কে উদাসীন থেকেছি। নিকটতম প্রতিবেশীর খোঁজ রাখিনি এত দীর্ঘসময় পাশাপাশি বাস করেও। তবে প্রতিদিনের যাপনে যে-সাম্প্রদায়িকতা রয়ে যায়, তাও কম ক্ষতিকর নয়। সে-ভাঙন দেখা যায় না বলে মেরামতের প্রয়াসও তেমন একটা চোখে পড়ে না। জীবন বয়ে গেছে গতানুগতিকতায়, পড়ে থাকা মানবজমিনে কর্ষণ হয়নি, স্বর্ণসম্ভারে ভরে ওঠেনি আমাদের ভাঁড়ার। বিপন্ন হয়েছে প্রতিবেশিতা। নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছিলেন, এ-দেশের জন্য মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা অবশ্যই ক্ষতিকর, কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বেশি ধ্বংসাত্মক। পৃথিবীর সব দেশে সব কালে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা বেশি ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে ঐতিহাসিক কারণেই। সুরজিৎ দাশগুপ্ত তাই এ-দেশের সাম্প্রদায়িক হানাহানির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসমাজের দিকেই আঙুল তুলেছেন। যেমন রেজাউল করিম মুসলমান সাম্প্রদায়িকদের বেশি সতর্ক করেছেন বার বার। তা নিয়ে তাঁকে কম কথা শুনতে হয়নি, ভুল বুঝেছেন অনেকেই। এই সাম্প্রদায়িক মনই একদিন দেশভাগ করেছে। দেশভাগের সূত্রপাতটাই ছিল খুব হাস্যকর। একটি সাক্ষাৎকারে সুরজিৎ দাশগুপ্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "দেশভাগ একটা ট্র্যাজেডি, আরও বড়ো ট্র্যাজেডি দেশত্যাগ। তার চেয়েও বড়ো ট্র্যাজেডি দু-দেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া বানানো।"

দেশের সীমান্তের কাঁটাতার তবু অতিক্রম করা যায়, দেশের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কাঁটাতার উপড়ে ফেলা কবে সম্ভব হবে তা মহাকাল জানে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা দেশভাগের মধ্য দিয়ে। ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হল দুটি রাষ্ট্র— ভারত ও পাকিস্তান। ভারতের তখনকার কর্ণধারেরা অধিকাংশই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। আর দেশ ভাগ হলেও প্রচুর সংখ্যক মুসলমান রয়ে গেল ভারতে। দেশভাগের পর মনে করা হয়েছিল যে, সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক ভাবনার অবসান হবে। তা হয়নি। বরং সাম্প্রদায়িক জটিলতা বেড়েছে জ্যামিতিক প্রগতিতে। বর্তমান ভারতে পাকিস্তানের থেকে বেশি সংখ্যক মুসলমান বাস করে এবং এ-দেশের জল-হাওয়া-অমৃতত্বে মিশে তাদের অধিকাংশই ভারতের প্রতি বিশ্বস্ত ও

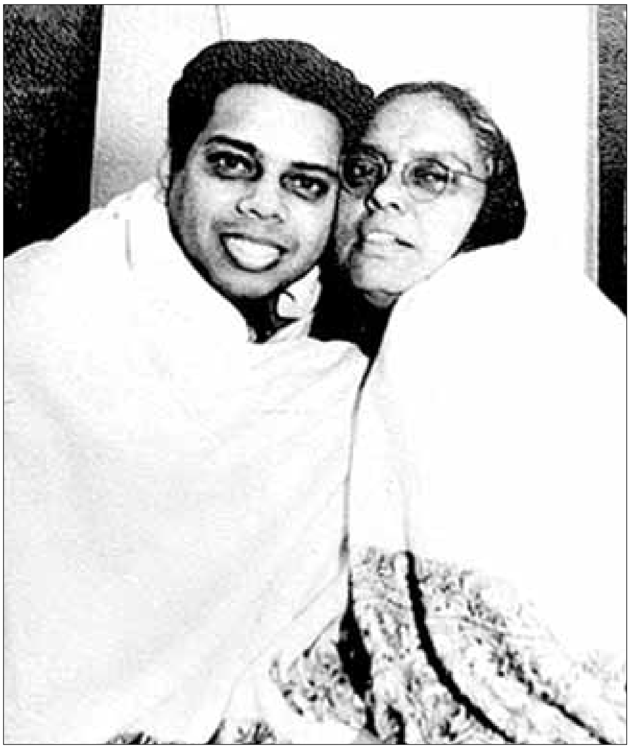

মায়ের সঙ্গে।

অনুগত। অথচ আমাদের রাষ্ট্রীয় রাজনীতি এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে অপর করে রেখেছে তাদের। অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তানের দফায় দফায় যুদ্ধ ও মনোমালিন্যের তীব্রতা, বাংলাদেশের জন্ম, পাকিস্তানের আক্রোশ, পরিণতিহীন কাশ্মীর-সমস্যা ও সন্ত্রাসবাদ— সব মিলিয়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজকে এক নিদারুণ সংকটে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আর এই দশা থেকে তাদের আশু মুক্তির কোনো সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে না। সুরজিৎ দাশগুপ্ত মরমি অথচ নিরপেক্ষ ও নিরাসক্তভাবে ভারতীয় মুসলমানের সামূহিক সংকট পর্যবেক্ষণ করেছেন।

স্ত্রীর সঙ্গে।

'ভারতীয় মুসলমানের সংকট'-এর সূচনায় সুরজিৎ দাশদুপ্ত অকপটে বলেছেন, "আজকের পাঠকের কাছে এটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে, একদা মুসলমানরা বিখ্যাত ছিল উদারতা ও সহিষ্ণুতার জন্য। মহান ইতালীয় রেনেসাঁসের ধ্রুপদি ঐতিহাসিক বুর্খহার্ট তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের 'ধর্ম ও রেনেসাঁসের আত্মা' শীর্ষকে মুসলমানদের উদারতা, সহিষ্ণুতা ও মানবিকতা কীভাবে রেনেসাঁসকে প্রভাবিত করেছিল তার কথা লিখেছেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রণেতা ফিশার তাঁর মহাগ্রন্থের প্রথমভাগে ইসলাম প্রসঙ্গে ... আরব মুসলিমদের উদারতা ও পরমতা গ্রহণশীলতা ও সভ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তবে এইসব গ্রন্থ লেখা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। সেকালে খুব কম মনীষী ভেবেছিলেন যে, এমন সময় আসবে যখন স্যামুয়েল পি হান্টিংটন খ্রিস্টান ও ইসলাম সভ্যতার সংঘর্ষের তত্ত্বরচনা ও ব্যাখ্যা করবেন অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমা বর্ষণ করে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার

নিদর্শনগুলি ধ্বংস করবে অথবা আফগানিস্তানের নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করবে।"

যাঁরা খোঁজ রাখেন, তাঁরা জানেন মূর শাসনে কতটা শান্তি ও সমৃদ্ধি এসেছিল, তৈরি হয়েছিল পরমত-সহিষ্ণুতার এক অনন্য নজির। সেখানকার ইহুদিরা খ্রিস্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল এবং তারা মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল। এম এন রায় তাঁর বিখ্যাত 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' বইতে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সাম্য, ইহজাগতিকতা ও উদারতার কথা কুণ্ঠাহীনভাবে স্বীকার করেছেন।

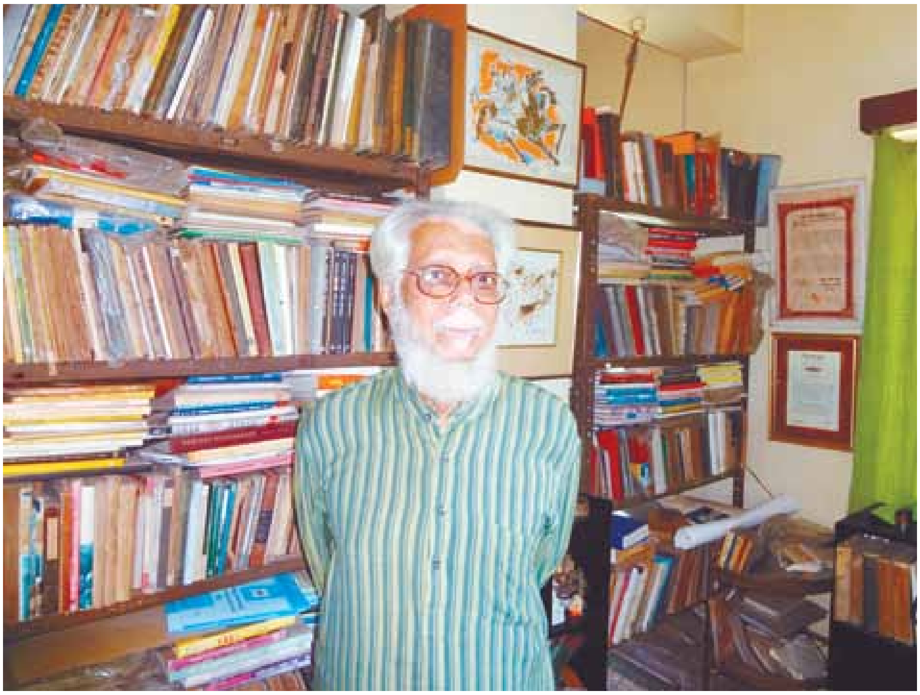

পুস্তক-পরিবেষ্টিত।

অনুভূতিশীল সচেতন মানুষ মাত্রেই জানেন ধর্মীয় মৌলবাদের সূচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারই সমকালে ভারতীয় আর্যচেতনার মোড়কে গুজরাতি-পঞ্জাবি-মরাঠি সমাজে হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ম। আর এ-সম্পর্কে লেখক মত ব্যক্ত করেছেন, "ধর্মীয় জাতীয়তাবাদই হচ্ছে মৌলবাদ যা আপাতদৃষ্টিতে অতীতের অভিমুখী হলেও আসলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থারই পরিণাম। অধুনাতন সংগঠনে-সংগঠনে প্রতিযোগিতায় মত্ত, ধার্মিকতার আড়ম্বরে উৎসবে আপ্লুত, পার্থিব সাফল্যের নেশায় উত্তেজিত, ভোগবাদে নিমজ্জিত, সামরিকতায় দর্পিত, নিজগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের স্বার্থে অন্ধ সমাজ সর্বপ্রকার প্রতিযোগী, সুবিধার অংশীদার, ভিন্ন মতাবলম্বীর ও স্বতন্ত্র সত্তার নির্মূলীকরণে উদ্যত এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের কাছে দারিদ্র্য নিবারণ, সমস্ত মানুষের বিকাশ ও সাম্য, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে অহিংসা, শান্তি ও সম্প্রীতি, প্রাতিস্বিক মর্যাদা, স্বতন্ত্রতা ও সৃষ্টিশীলতা অর্থহীন। স্বভাবতই এই পরিবেশে সংখ্যায় লঘু, বিত্তে লঘু, পেশিতে লঘু পরিশীলিত বুদ্ধিজীবী যুক্তিবাদী নির্বিরোধ শান্তিপ্রিয় কোনো মানুষই নিরাপদ নয়।"

এ যেন এক সমস্যার সিন্ধু দর্শন। অন্য মত পোষণের সামান্যতম সুযোগও নেই লেখকের সঙ্গে। আর এই ধর্ষকাম প্রক্রিয়ার শিকার মুসলমানরাও হতে পারে, তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকে না।

১৯৮৫ সালে লেখককে গুজরাতের বরোদাবাসী গান্ধীবাদী হরষিত

এখন আমাদের কর্তব্য অহিংসা, শান্তি, সম্প্রীতি ও শুভবোধকে বাঁচিয়ে রাখা অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। আজ আগলভাঙা ঝড়ের রাতে পারস্পরিক বিশ্বাসের কম্পমান প্রদীপশিখাটিকে আগলে রাখতে হবে আন্তরিক চেষ্টায় এবং সেটাই সুরজিৎ দাশগুপ্তের প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠতম এক সম্মাননা।

ভাই বলেছিলেন, সোমনাথ লুণ্ঠনের শোধ না হওয়া পর্যন্ত কোনো গুজরাতি শান্ত হতে পারে না। তাহলে ১৯৯২ সালে সুরাটের বর্বরতার দশ বছর পরে ২০০২ সালে গোধরা-পরবর্তী মানুষ নিধনে ও নানা পৈশাচিক কাণ্ডে হরষিত ভাইয়ের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। এবং অপরাধী, অপরাধে সহযোগী ও অপরাধের মানসিক সমর্থক ও হত্যার হিংস্রতায় বিশ্বাসী বিশাল এক ভারতীয় সমাজ গড়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে কেবল সংকটে মুসলমানরা নয়, সংকট সমস্ত ধর্মের দুর্বলদের, সমস্ত ধর্মের মননশীল ও মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী, শান্তিবাদী, সম্প্রীতিতে ও সত্যে বিশ্বাসী মানুষের। ধর্ম আজ মানুষের প্রধানতম পরিচয়চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশে। এক্ষণে আমরা স্মরণ করতে পারি 'ধর্মের অধিকার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ইহাতে কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, ধর্মের বিকারে গ্রীস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই।" আমাদের বোধোদয় হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে আশার কথা, সমস্ত উত্তেজনার শেষে অনিবার্যভাবে আসে অবসাদ ও ক্লান্তি। এ-জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়। পৃথিবী ক্যাওস থেকে কসমসে ফেরে। আমরা জানি আমাদের বিপরীত অবস্থানের দুর্জনেরা অর্থে ও অস্ত্রে আত্মরক্ষায় সমর্থ, অন্যদিকের নিরপরাধরা নিরস্ত্র ও অধিকাংশই প্রায় নির্ধন। প্রেম ও মানবতা, সত্য ও সাহসই তাদের সম্বল। আজ দেশের সর্বত্র এক বৈরী পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ডাকিনিরা চারিদিকে বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলছে। মানবতা আর সত্য, যুক্তি আর কাণ্ডজ্ঞান আজ ধূলিলুণ্ঠিত। সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। বিচারের বাণী শোনা যাচ্ছে না কোথাও। জনগণতান্ত্রিক পরিসরে প্রশাসন ও সরকার কেমন অবান্তর হয়ে উঠেছে। এখন আমাদের কর্তব্য অহিংসা, শান্তি, সম্প্রীতি ও শুভবোধকে বাঁচিয়ে রাখা অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। আজ আগলভাঙা ঝড়ের রাতে পারস্পরিক বিশ্বাসের কম্পমান প্রদীপশিখাটিকে আগলে রাখতে হবে আন্তরিক চেষ্টায় এবং সেটাই সুরজিৎ দাশগুপ্তের প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠতম এক সম্মাননা। ■

কথায় আছে, গাঁয়ে আর মায়ে সমান। হুই যে দূরে সবুজ রেখা, ওই দিকেই গেছে রেললাইন, রাজ্য সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা। কোথাও-বা আলপথ। সব পথই গেছে কোনো-না-কোনো গাঁয়ে। কেননা, বাংলায় গ্রামই এখনও সংখ্যায় অধিক। আর বঙ্গাদর্শনের ইচ্ছে হলে যেতে হবে ওইসব গ্রামদেশে।

জ্যান্ত চালচিত্রের কহানি-কাব্য

অশোককুমার কুণ্ডু

অ ষ্ট ম কি স্তি

“মানুষ হল উড়ন্ত বীজ। দুরন্ত পথিক। একই পথে সে হাঁটে এবং ভাবে, পথটি বুঝিবা নিত্য নবীন। সুজন-স্বজন, হাসি-কান্না, চোখের পানি, কবরের আশ্রয়— সবই ওই একই পথে। মরুর পথে। ঊষর পথে। মরূদ্যানের খোঁজে। তুমিও তাই। আম্মোও।” বলেছিলেন লাল ফকির। সাকিন বাঘারপাড়, পঞ্চায়েত ভাদুর, মহকুমা আরামবাগ, জেলা হুগলি। পিনকোড ভুলেছি।

লাল ফকির কেন? গায়ের জোব্বার কাপড়ের বেশিটা লাল। বাকিটা কাবার কালো। কিছুটা, ‘গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির’, পথিক বাউলের রং। কোথাও কোথাও অরণ্যের সবুজ। এমন পোশাক বানিয়ে দিত কালীপুরের দ্বারকেশ্বরের পাড়ের কদ্রু মিয়া। জোব্বাটা ঢোলা। বাতিল সব টুকরো কাপড়ের মেলা, তারা সাজত লাল ফকিরের জোব্বায়।

সে ছিল আমার নানার বন্ধু। দু-জনে গল্প বললে ভোরের সূর্য আসত দোর ঠেলে। অবশ্য তার পরে চলে যেত চাঁদ। চাঁদ ডুবলে শুকতারা। লাল ফকির রেহেলের সামনে বসে ভান করত, যেন সে কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়ছে। শূন্য রেহেল। সেখানে লেখা আছে বুঝি এই বাংলার পল্লির পদাবলি। রূপসি বাংলার আবরণহীন শরীরের মুথা ঘাস। দোয়েল-কোয়েল আর ফিঙেদের কথা মুখস্ত বলে যেত সে। লাল ফকির জ্ঞানী। তবে অক্ষরজ্ঞানহীন।

লাল ফকিরের কওয়া গল্প! সে তিন-চার মাস এক নাগাড়ে শিষ্যবাড়ি পরিক্রমা করে, যখন ফিরে এসে ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনাত, গোটা জনপদ বোবা সাজত। লাল ফকির তার ফকিরি ঝোলায় হাত যখন ঢোকাত, তখন আশমানের সন্ধ্যাতারা নেমে আসত। আমি লাল ফকিরের কোলে বসে শুধাতাম, “লাল নানা তুমি বাঘারপাড়ে যে থাক, সেখানের সব বাঘ মেরে ফেলেছ?”

লাল ফকির তার ঝোলা দাড়িতে হাত বুলিয়ে, হড়পা বানের হাসির স্রোত বহাত। বলত, “বাঘ আবার কেউ মারে নাকি?”

না মারলে তো তোমায় খেয়ে ফেলবে তারা।

ওদের খিদে পেলে, আমার ফকিরি ঝোলা থেকে ওদের জন্য তখন খাবার বের করে দিই।

হ্যাঁ? বলো কী লাল নানা! তবে বাঘেরা হালুম করে ভয় দেখায় কেন?

ওরা ভয় দেখায় না। ডাকে। তাদেরকেই ডাকে, যাদের রাগ নাই, হিংসা নাই। তুমি আর-একটু বড়ো হয়ে বুঝবে সব।

এমন বাক্য বলে, ঝোলাটি কাঁধে গলিয়ে বাঘারপাড়ের লাল ফকির নামত পথে। যাবার আগে বলে যেত, "যো জগৎকা ফিকির সবকৈ খা লিয়া, ওহি নে সাচ্চা ফকির।"

স্নেহকণ্ঠে, "বেটি, বেটি" ডাকত আমার মাকে। তখন আম্মা বেরিয়ে এলে লাল ফকির ঝোলা থেকে সাদা চামর, ওর ঝুলন্ত দাড়ির মতনই দেখতে, বের করে, নেমে আসা আশমানের দিকে কিছু খুঁজত। তারপর চামরটি আমার আম্মার মাথায় বোলাত। আমার মস্তক চুমে বলত, "আম্মা হল আল্লার সংসারে পরম ধন।" সে পথে নামত। তার পরে পিছু ফিরে আর তাকাত না। কাফেলার মতো বাতাস হয়ে যেত।

আম্মা হল পরম রতন। তাকে রক্ষা করাই ধরম। আজ উপলব্ধি করি লাল নানা জীবনের সেরা পাঠটি আমায় দিয়ে গেছে। সেই সঞ্চিত পাঠ-পৃষ্ঠাগুলি, রিখিয়া, এই বসন্তে, মা আমার, তোমার করতলে দিয়ে বাতাস হতে চাই। পলাশ-বাতাস। চলে যেতে চাই টাঁড়-টহরে। বাদাবনে। তুমি এই পাণ্ডুলিপি, অপ্রকাশিত শব্দগুলি, বাক্যগুলি, নেবে তুমি রিখিয়া?

***

আমি শঙ্কা-স্নেহকণ্ঠে ডেকে উঠি, "বেটি, বেটি, বিটিয়া।" উড়ন্ত কন্যা শুধু, চোইত পবন হাহাকার করে, শূন্যে ধায়, পাণ্ডুলিপির কালো ছাই, চিতাভস্ম থেকে অপার প্রশান্তিতে বলে যায়, "নাই নাই নাই। কেহ নাই এ-নিষ্ঠুর সংসারসীমান্তে। কেউ নাই। জল দানে যাও।"

চিত্ত বাপ বলে, "আছে। আছে গো এ-ভবসাগর তারণে। খুঁজে নাও তারে। খোঁজো। অন্তহীন খোঁজ। ছেদহীন খোঁজা স্বপ্নের আখরে। মিলবে, মিলবে, মিলবেই।"

গাঁয়ের নাম আকুই। বর্ধমান-বাঁকুড়ার সীমান্ত গাঁ। আকুই বাঁকুড়া জেলার সমৃদ্ধ গ্রাম। দু-দিকে বর্ধমান জেলা এবং হুগলি জেলা। মিশে আছে বাঁকুড়ার খরতপ্ত মৃত্তিকার সঙ্গো বর্ধমানের পলি মাটির উর্বর সহানুভূতি।

মিলেও গেল সেন জায়াদের চক মেলানো চাঁদের উঠোনে। পূর্ণিমা-ভাসা জানালা, দরজার চৌকাঠে। চোরা কুঠরিতে। লুকোনো স্বপ্নে মিলে গেল, ঝিয়ের পেটে মায়ের জনম। তিন মা। তিন বাবা। একই সংসার-গেরস্থালি। একই কন্যা। একটাই স্বামী। একটিই পুত্রসন্তান।

রিখিয়া তুমি কি কখনো দেখেছ, এক-আকাশে তিন চন্দ্রমা? একই ধরণীর মৃত্তিকার পরে, এক-আশমানে তিনটি সুরজ? আমি দেখেছি। তাদের পরশ পেয়েছি। প্রথম দেখায় তা ছিল অবিশ্বাস্য। ছিল স্বপ্নবৎ। তবে ভোরের স্বপ্ন তো। শুকতারা সাক্ষী। সে বলেছিল, ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে নয়। জানি রিখি, তুমি হয়তো বলতে পার, "এসব টাইম-কিলিং গপ্পো, ওয়েস্ট অফ এভরিথিং।" আমি, উত্তরে মৌন থাকব না। যে-বাক্যগুলি কণ্ঠনালী ফুঁড়ে রক্তাক্ত স্মৃতি, তা তোমাদের এই বেদিমূলে নিবেদিত হোক। তোমার শরীরে বইছে আমার শোনিত-স্রোত। এসো তোমায় বোকা বুড়োদের গল্প বলি।

শুরু করি মজাদার জীবনরসের এ-গল্প। গল্পের পাত্র-পাত্রীদের অনেকেই ছুটিতে, পারাপারের শান্তি গাঁয়ে। শস্যকণা, ছেঁদা পয়সা, হাতের বুলি, ছোট্ট নাকছাবি, মাথার খোঁপার পেরজাপতি, ধুতির কোঁচা, বৃদ্ধের পথসঙ্গী তেল চকচকে লাঠি, জানালার গরাদ, ফোকলা দাদুর ছোকরা গাল— কিছুই নিয়ে যায়নি। সব রেখে গেছে সোনার সংসারের নাটমঞ্চে।

কোথা থেকে শুরু করব এ-কাহিনি? পাত্র-পাত্রীদের নাম বলব ঠারেঠোরে। কিছুটা ডালের বাটিতে ডুবন্ত এবং ভাসন্ত, যুগপৎ, পাঁচফোড়ন। কিছুটা রাগ-অনুরাগের ভোরের আলো-আঁধারের ফজরের আজান। কিছুটা দিন-শেষের আলো ও আমন্ত্রিত অন্ধকারের স্বরলিপি। তে-তালা আহির ভৈরব।

গাঁয়ের নাম আকুই। বর্ধমান-বাঁকুড়ার সীমান্ত গাঁ। আকুই বাঁকুড়া জেলার সমৃদ্ধ গ্রাম। দু-দিকে বর্ধমান জেলা এবং হুগলি জেলা। মোগলমারি থেকে বোয়াইচণ্ডী হয়ে আকুই গ্রাম। মিশ্রিত সংস্কৃতি হুগলি-বর্ধমান এবং নিজ ঘর বাঁকুড়া। মিশে আছে বাঁকুড়ার খরতপ্ত মৃত্তিকার সঙ্গো বর্ধমানের পলি মাটির উর্বর সহানুভূতি। অনেকটা ওই ভাসন্ত পানির ওপর তেলের ছিটে, যেমন ভাসে জামাইয়ের মাছের ঝোলে। তা আকুই গ্রামের মানুষটি বাঁকুড়া-বর্ধমানের উর্বর কৃষিমৃত্তিকা ছেড়ে চলে এলেন নগর কলকাতার আধুনিক পাঠ নিতে। থেকে গেলেন এই তিলোত্তমার ক্রোড়ে। হল বিয়ে, অধুনা ঝাড়খণ্ডের রাঁচির মহিলার সঙ্গো। প্রবাসী বাঙালি। সন্তানাদি, ভরাসংসার ছেড়ে একদিন ...

ওঁরই, না, মানে ওঁদের মধ্যম পুত্রের বিয়ে হল বিস্ময়কর একজন নারীর সঙ্গো। নাম? বদলে নিই। আমি ডাকি, বাংলাভাষায় স্নেহভরা বিশেষ্য, 'দিদিমণি'। দূর! তোমার তো সব সৃষ্টিছাড়া নাম। আচ্ছা, ওটা একটা নাম

হল? আচ্ছা, বেশ। তবে, নাম দিই একটা। টুকটা। টুকু। টুক-টাক। পুরুলিয়ার আদরের শব্দ 'টুকু'। অর্থ, ছোট্ট। টুকু ভিটে। টুকু জমি। ইনি, এই টুকুদি আমার আজকের কাহিনির মধ্যমণি। এঁরই তিন মা, তিন বাবাকে নিয়ে চলন্ত জীবন। জীবনের চালচিত্র এখনই দেব বর্ণনা।

টুকুদি আমার চেয়ে অনেকটাই বয়সে ছোটো। ভাবনায় অনেক বড়ো। দিগন্তপ্রসারিত তাঁর চালচিত্রে তিন মা। তিন বাবা। আজও টুকুদির সংসার চলমান অনেককে নিয়ে। আত্মীয়দের আসুন্তি-যাউন্তি হপ্তান্তে। নিজে, দিদিমণি একটি স্কুলের। সেখানে তাঁর কত্তো ছেলে-মেয়ে! ঘরের আত্মীয়দের মান-অভিমান নিয়ে তাঁর চলা। আমি টুকুদির সংসারকে বলি, আধুনিক মুসাফিরখানা।

তুমি রিখিয়া বলবে হয়তো, "স্টুপিড, যত্তো সব। বড়ো সংসারে ইনডিভিজুয়ালের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।" তবে এসো আজ, এই আমার দিন-শেষের বেলায়, হয়ে যাক বাপ-বেটিতে লড়াই। এই টুকুদি যদি ইয়োরোপে জন্মাতেন অথবা পশ্চিমবাংলায় তাঁর সংসারের গল্প লিখে ছাপাতে পারতেন পশ্চিমে, সাগরপারের বড়ো প্রকাশনার ঘরে। তবে তা হত হট কেক সেল। তখন, তোমরা রিয়া, দু-হাতে তালি বাজাতে। অপ-এড, এডিট (উত্তর সম্পাদকীয়, দৈনিক পত্রে) লিখতে।

বড়ো সংসারে একক মনের বিকাশ হয় না মেনে নিয়ে বিনত প্রশ্ন, "ছোট্ট সংসারের সংসার থেকে কেন বেস্ট সেলার হয়ে ওঠে, 'প্লেজার অফ সুইসাইড' অথবা 'হাউ টু ডু সুইসাইড'। থাক, এ ঘন কালো ভয়ার্ত ছিন্ন সস্তার রূপক-অন্ধকার-কাহিনি। দোষ আজ আর কাউকেই দেব না। দেব না মান্ধাতার বাবার আমলকে। অথবা তোমার বাবার বা তোমার আমলকে। কারণ, কারণের সাকিন মেলে ঝড়ের পরে। গৃহদাহের নির্বাপিত ভস্মের ওপর। কী গেল! কতটা হারিয়ে গেল। কেমন করে, কোন ভুলে লেগেছিল অগ্নি।

ওই যা! কাহিনির কুড়, সূচনামুখ হারাচ্ছি বুঝি। ওই টুকুদির সংসার। তাঁর মন। তাঁর আচার-বিচার। তাঁর তিন মা, তিন বাবা নিয়ে বেঁচে থাকা। একটা 'জোড়' (জোড়া) শ্বশুরকুল বাঁকুড়া এবং বিহার (বর্তমান ঝাড়খণ্ড)। আর একটি 'জোড়' (জোড়া) যশোরের বসু-পরিবারের চিন্ময় বসু। তাঁর বিয়ে হল হুগলির মুথাডাঙার কল্পনার সঙ্গে। বাঙাল-ঘটির স্বপ্নের ঘর। এখন তো এটা জল-ভাত, ডাল-ভাত। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বের পর্বান্তর, গোত্রান্তর, ছাঁদনাতলা কম কথা? অবিশ্যি যশোরের এই বসু-পরিবার পদ্মা পেরিয়ে গঙ্গার পাড়ে পাকা বসতে। কলকাতার ভবানীপুরের পূর্ণ সিনেমা হলের উলটো দিকের রাস্তায়। এঁরা হলেন টুকুদির পালিত মা এবং বাবা। ওই হল। পালক মা-বাবা কি গায়ে লেখা থাকে নাকি? যে কোল দেয়, যে বুক দিয়ে আগলে রাখে, সেই তো মা। জন্ম-জন্মান্তরের বাবা-মা। অন্তিম যে মাটির কোল দেয়, সে-ও তো 'মা'। তাই তো দেশ কেড়ে নিলে মা-বাবার সব কেড়ে নেওয়া হয়। কত কত বর্ডার, কাঁটাতারের বেড়ার নিশেন ভিজে যায় অশ্রু ও খুনে। কোল বা ক্রোড় বৃক্ষকেও দেয় শোকার্ত মানুষ। শ্মশানের পূর্ণকলসের ওপর, ভাসন্ত আশমানকে মিশিয়ে দেয় বহমান বিশ্বের পথে ওই কলস ভেঙে — শোক থেকে মুক্তি পেতে। শ্মশানবন্ধুরা দিঘিতে স্নান সেরে, ওরই পাড়ের গাছকে জড়িয়ে, বেড় দিয়ে বলে, "আমার দুঃখ তোমার হোক। তোমার দুঃখ আমায় দাও।" এই রূপসি বাংলার পদাবলির প্রকোষ্ঠে এমন দুঃখ-বিনিময় আর কোথায় হয় জানা নেই। ওই বৃক্ষ আসলে ক্রোড়দাত্রী মা। অশ্রুসিক্ত মা।

ও রিখি মা। ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? এই গঞ্জ-গপ্পো তোর কাছে বোধ করি ক্লান্তিকর। তবে ঘুমিয়েই থাক।

রিখি, তুমি কখনো এই 'মায়ালতা' বৃদ্ধাশ্রমে এলে, আমাদের টুকাই দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তোমার সমাজবিদ্যার পাঠ পূর্ণ হবে হয়তো-বা।

এবার টুকুদির গর্ভধারিণীর কথা। তিনি শ্যামলী, কলকাত্তাইয়া। বড়শের সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের ডাল-পাতা। বিয়ে হল বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে। আদিটা টাকীর বনেদ। কোথাকার জল যে কোথায় গড়ায়, তা জলও জানে না। জানে শুধু অববাহিকা এবং সমুদ্দুর। দিগন্তহীন এই জলাধার জানে, সব স্রোত এসে তারই ক্রোড়ে কোল পাবে। সূর্য মিটিমিটি হাসে। সে যে ধাত্রী গ্রামের একক বাসিন্দা। গ্রীষ্মে জলাভূমিকে আশ্রয় দেয় আশমানে। লালন-পালন করে ফেরত দেয় মৃত্তিকারই কোলে, ভরা বাদলে, মাহ ভাদরে। ঈশানের

বজ্র-বিদ্যুৎ তাকে পথ দেখায়। সব সভ্যতা, সব স্বপ্ন, খিয়া তোমার ক্রোড়ে আলো করে আসে। আবার আঁধার করে, শূন্য করে ফিরে যায়।

তাহলে কতগুলো মা-বাবা হল? প্রথমে জন্মদাত্রী মা ও জন্মদাতা বাবা। ওই তোমরা যাকে বায়োলজিকাল পেরেন্ট কও। তারপরে হল পালক পিতা ও মাতা। তারপরে, বিবাহসূত্রে শাশুড়ি-মা ও শ্বশুর, যাকে মাতা-পিতাই বলা হয়। তোমাদের ভাষায়, রিখিয়া যাকে তোমরা বিশেষণে মাল্যভূষিত কর, ইন-ল পেরেন্টে।

এক-জীবনে কতগুলি স্থলের সংস্কৃতির বাহক হলেন আমাদের টুকুদি, টুকাই দিদি? জন্মসূত্রে ও পারিবারিক সূত্রে টাকী হয়ে ভবানীপুর, খাস কলকাতাইয়া ভবানীপুরে পূর্ণ সিনেমা পাড়ায় বাস। মায়ের বাপের ঘর ব্যায়লা সাবর্ণ চৌধুরীদের বনেদি লতাপাতা। পালকসূত্রে যশোর (বাংলাদেশ) এবং হুগলি চাঁপাডাঙা পেরিয়ে, মুন্ডেশ্বরী পেরিয়ে মুথাভাঙা, হুগলি জেলার সমৃদ্ধ এক গ্রাম। তারপরে শেষ, মা-বাবা। শ্বশুরকুল বাঁকুড়ার এক গণ্ড (বৃহৎ, সমৃদ্ধ) গ্রাম।

এই হল আমার টুকুদি অর্থাৎ টুকাই দিদির সাংস্কৃতিক বহুমুখী স্রোতের পলি। কিন্তু খাস কলকাতার কন্যা বাঁকুড়ার পথে! এই তো সেই, 'বর্ধমানের বর আর বরিশালের কনে'র গল্প। কিন্তু পথ গেল কী করে ওই পথে? এ যে পূর্ণ চলচ্চিত্রের গল্প। পালক মা-বাবা থিতু হলেন একই পাড়ায়, পড়শি পাড়ায়, যেখানে জন্মদাত্রী মা ও বাবার বাসস্থল। টুকাই দিদির প্রায় গোটা দিন রাত কাটত পরবর্তীকালের পালক মা-বাবার বাড়িতে। নিঃসন্তান দম্পতির চোখের মণি টুকুদি। টুকুদিরা চার ভাই-বোন। টুকুদি বড়ো হচ্ছে। জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী, পারিবারিক সিদ্ধান্ত হল, হস্তান্তর। রায়চৌধুরী-বাড়ি থেকে বসু-বাড়ি। একটা বাচ্চার এসব বোঝার বয়স না। তখন সদ্য কিশোরী ডাইসেশনের ছাত্রী। পরে বুঝেছিল। যখন গোখলে কলেজের পড়ুয়া। তার এসবের বোধ খুব একটা সক্রিয় ছিল না। জন্মদাত্রীর পাশের বাড়ি পালিকা মায়ের। দু-বাড়িতেই কেটেছে নিত্যদিনের বেলা-অবেলা।

আজও এই বাস্তব, সচল 'টকী'র পরশে বিস্ময়া-মুগ্ধ হই। মানে, বুঝি এটির বাস্তব চৌকাঠ নেই। সবটাই গল্প। তুমিও অবিশ্বাস করতে পারো এই সুরহীন পালকির গানে, মামলায় মামলায় রক্তাক্ত সম্পর্কে। ক্রোধে ভস্ম করি একক মনের অপূর্ণ বিকাশ। বরং বেঁচে থাকুক যৌথ বন্দনাসংগীতে। রিখিয়া, তোমাকে অত্যাধুনিক ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট শেখায়, প্রোডাকাশন হল যৌথ উদ্যোগ। টিম ওয়ার্কের উদ্‌বৃত্ত ফসল। আর এই কো-অপারেটিভ অপারেশনের সৈনিকদের অনেকেরই ভগ্ন-ভস্ম যৌথ জীবনে, ভাঙা পথের ছিন্ন রাগ। আক্রোশ ও অভিমান। হে আধুনিক সময়, অত্যাধুনিক যন্ত্রসভ্যতা, আমি আশ্রয় চাই। তুমিই বলো, কোথায় গেলে পাই?

টুকুদির চার ভাই-বোন, শ্বশুরকুলের অধ্যাপক ভাসুর-দেবর, সাংবাদিক স্বামী সকলকে নিয়েই তো একটা গোটা জীবন। আপন ঘরের দরজা সকল বাতাসের জন্য, হাট করে খোলা। তিন মা, তিন বাবা টুকুদির কোলেই চোখ বুজেছেন। শুধু কম্পিউটার শিখে উঠতে পারলেন না। এখন শেষবিকেলের আলোয় চেষ্টা করছেন কমিউনিটি হলে। বারান্দার রোদে, মহাদেব স্বামী সব দেখে মিটিমিটি হাসছেন। একমাত্র পুত্র বুড়ো, ন্যু ইয়র্কে, আর্টিফিশিয়াল মেমরির সন্ধানে। টুকুদির হাসিতে জ্বলে ওঠে বৃদ্ধাশ্রমের আলো। তিনি বলেন, যেকোনো অবস্থাকে সঙ্গী করে ভালোবাসতে হয়, তাহলে চোখ ভরে উঠবে না অশ্রুতে। আর আমার চোখের জল মুক্তোর চেয়ে দামি। তা চাবি দিয়ে রেখেছি সিন্দুকে। দেখাব কেন?

রিখি, তুমি কখনো এই 'মায়ালতা' বৃদ্ধাশ্রমে এলে, আমাদের টুকাই দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তোমার সমাজবিদ্যার পাঠ পূর্ণ হবে, হয়তো-বা। ■

'আল-আমীন বার্তা
দেখে পড়ার । পড়ে দেখার
আল-আমীন মিশন
একটি পরিবার। এই পরিবারের সদস্য আপনিও।
পরিবারের মুখপত্র
'আল-আমীন বার্তা
নিজে পড়ুন। অন্যকে পড়ান

আমরা যাকে কাঁকড়াবিছা বলি হিন্দিভাষীরা তাকেই বিচ্ছু বলে। সত্যিই মারাত্মক বিষ সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এই প্রাণীটি ভয়ানক বিচ্ছু। অ্যারাচনিডা শ্রেণিভুক্ত প্রাণীটির পরিচয় এ-বারের পাতায়।

ভয়ানক বিচ্ছু

এন জুলফিকার

অনেক দিন পর আজ একটা নির্ভেজাল গ্রামীণ হাটে এলাম। আর মনটা ভরে গেল। আমি যেন কিছুক্ষণের জন্য ছেলেবেলায় ফিরে গেলাম। হাটে, মাঠের মতো অনেকটা খোলা জায়গায়, যে যার মতো মাটিতে পসরা সাজিয়ে খদ্দেরের আশায় বসে আছে। আর লোকজন সামনে ভিড় করে তাদের পছন্দের জিনিসপত্র কিনছে।

আচ্ছা, তোমরা কি কেউ গ্রামের হাটে গেছ কখনো? আশা করি হাট বলতে কী বোঝাচ্ছি, তা বুঝতে পারছ। যারা গ্রামে থাক তারা তো জানই। অবশ্য এখন বেশিরভাগ জায়গায় হাট লুপ্ত হতে বসেছে। কী, এখনও কি কেউ কেউ হাট কাকে বলে তা বোঝনি? তোমরা যারা ছোটো থেকেই শহরে মানুষ হয়েছ, তাদের অনেকের কাছেই অবশ্য এটা নতুন শব্দ। তবে তাদের মধ্যেই কারও কারও হয়তো রবি ঠাকুরের লেখা 'হাট' কবিতার কল্যাণে হাটের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। সেই যে, সেই বিখ্যাত কবিতা—

... হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্‌শিগঞ্জে পদ্মাপারে।
জিনিস-পত্র জুটিয়ে এনে
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে। ...

'হাট' নিয়ে আরও একটা বিখ্যাত কবিতা আছে। তোমরা কি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর সেই জনপ্রিয় কবিতাটি পড়েছ? ছোটোবেলায় আমরা কিন্তু তা পড়েছি। তাতে হাটের চমৎকার বর্ণনা আছে। একটু শোনাই, কী বলো—

দূরে দূরে গ্রাম দশ-বারোখানি, মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা কেনা সেরে বিকেল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়;
বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পুবের মাঠ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ—আঁধারেতে থাকে হাট। ...

আশা করি এতক্ষণে হাট সম্পর্কে কিছুটা ধারণা জন্মেছে। আগে, যখন এত দোকানপাট ছিল না, এখনকার মতো এতসব অনলাইন শপিং

ছিল না, তখন বেশ কয়েকটি গ্রাম মিলে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হাট, অর্থাৎ অস্থায়ী বাজার বসত। সাধারণত সপ্তাহে দু-দিন। গ্রামের মানুষ ওই দু-দিন হাটে এসে সারাসপ্তাহের বাজার করে নিয়ে যেত। বাকি দিনগুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার উপায় ছিল না। বাড়িতে যা আছে তাই দিয়েই চালিয়ে নিতে হত। বুঝতে পারছ তো, আমাদের পূর্বপুরুষদের কত কষ্ট করে দিন কাটাতে হত! অবশ্য জীবনধারণের জন্য আমাদের মতো এত চাহিদাও তাঁদের ছিল না। তাঁরা অল্পেতেই সন্তুষ্টছিলেন।

যাক, যে-কথা বলছিলাম।

হাটে ঢোকার মুখেই হঠাৎ বৃষ্টি এল। তাড়াতাড়ি একটা ছাউনি দেওয়া জায়গায় ঢুকে পড়লাম দু-জনে। আবার মুহূর্তের মধ্যেই বৃষ্টি থেমেও গেল। আমার সঙ্গে তোমাদের চেনা সে-ই সবজান্তা বন্ধু। ঘুরতে ঘুরতে দু-জনে চলে এলাম হাটের আরেক প্রান্তে। এখানে বিচিত্র সব পসরা সাজিয়ে বসেছে কয়েক জন। চৌকো একটা জায়গার চার কোণে লোহার শিক পুঁতে জায়গাটা ইঞ্চি ছয়েক চওড়া লাল কাপড় দিয়ে ঘিরে নিয়েছে যে, সে বিক্রি করছে এক ‘জবরদস্ত তেল’। তার ঝাঁজ নাকি নাক দিয়ে একটু টানলেই সর্দি-কাশি সব উধাও। তা সে যত পুরোনো সর্দিই হোক-না-কেন! দোকানদারের বলার কায়দায় লোকজন কিনছেও বেশ। আমরাও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম সে-দিকে। দেখি, ছোট্ট একটা ডেচকির মধ্যে অসংখ্য মরা কাঁকড়াবিছা! আর তার ওপরে গোটা দুই-তিন জ্যান্ত। হুল বাগিয়ে দিব্য ঘুরছে তার মধ্যে।

আমি বললাম, “কী রে, চিনতে পারিস একে?”

সে বলল, “স্করপিয়োকে চিনব না! এদের দেখেই ‘স্করপিয়ো দস্যু’ নামটা বোধ হয় এসেছে কল্পবিজ্ঞানের গল্পে।”

ওকে একটু খোঁচানোর জন্য না-জানার ভান করে বললাম, “সে আবার কী?”

ও বলল, “সে তুমি বুঝবে না। যারা ফ্ল্যাশ গর্ডনের কমিক্স-টমিক্স পড়ে, তারা জানে।”

আমি বললাম, “তা-ই বুঝি! আচ্ছা, এটা কি সেই কমিক্সের বইটা, যেটা ‘টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া’ ‘ইন্দ্রজাল কমিক্স’ হিসেবে বের করেছিল?”

“ও, তবে তো তুমি জান!”

“একটু একটু জানি তো। সেখানে ফ্ল্যাশ গর্ডন ছাড়াও আরও অনেক কমিক্স ছিল। বেতাল, ম্যানড্রেক, রিপ কার্বি, কেরি ড্রেক, বাজ সয়্যার, বাহাদুর তো ছিলই; তার সঙ্গে আরও দু-একটি নায়কচরিত্রও ছিল। ছেলেবেলায় আমরা ইন্দ্রজাল কমিক্স পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকতাম।”

“তা-ই বুঝি? তার মানে বাংলায় এই কমিক্সগুলো অনেক আগে বেরিয়েছিল!”

“সে তো বটেই। ইন্দ্রজাল কমিক্সের প্রথম বত্রিশটা সংখ্যার সব ক-টাই ছিল লি ফকের লেখা ফ্যান্টম বা বেতালকে নিয়ে। বাংলায় প্রথম এই কমিক্স বেরিয়েছিল ১৯৬৬-তে। তা ছাড়াও এই কমিক্সের জনপ্রিয়তার কারণে এরা হিন্দি, মরাঠি, গুজরাতি, মালায়লম, কন্নড় ও অন্যান্য ভাষায় তা বের করেছিল। জানিস তো, মোট ৮০৩-টি ইন্দ্রজাল কমিক্স প্রকাশিত হয়েছিল। যাক সেসব কথা। এখন বল তো, তুই তোর এই স্করপিয়ো সম্পর্কে আর কী কী জানিস।”

“বলব? আমার ধারণা, তুমিও অনেক কিছুই জান। তবুও, ঠিক আছে, শোনো তাহলে।”

আমরা যাকে কাঁকড়াবিছা বলি হিন্দিভাষীরা তাকেই বিচ্ছু বলে। সত্যিই মারাত্মক বিষ সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এই প্রাণীটি ভয়ানক বিচ্ছু। কাঁকড়াবিছা অ্যারাচনিডা শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। অর্থাৎ এরা কিনা মাকড়সা, হর্স স্যু ক্র্যাব, এদেরই সমগোত্রীয়। প্রাণীবিদরা কাঁকড়াবিছার দেহকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করেছেন— মাথা (প্রোসোমা), পেট (মেসোসোমা) ও লেজ (মেটাসোমা)। মাথা অংশে থাকে চোখ, মুখ ও দুটো লম্বা দাঁড়া। পেট অংশে আছে খাঁজ-কাটা সাতটি অংশ, যেখানে তার চার জোড়া পা থাকে। আর লেজ অংশে আছে আরও পাঁচটি খাঁজ-কাটা অংশ এবং লেজের শেষে আছে তার দেহের সবচেয়ে ভয়ানক অস্ত্র— বিষাক্ত হুল। আটটা পা, দুটো দাঁড়া ও লেজের শেষে বিষাক্ত হুল নিয়ে এরা স্বমহিমায় ঘুরে বেড়ায়।

বিষ তৈরির জন্য স্করপিয়োর দেহে দুটি গ্রন্থি আছে। শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য এ তাদের চরম অস্ত্র। সবচেয়ে বিষাক্ত কাঁকড়াবিছার নাম কী জান? ভারতীয় লাল কাঁকড়াবিছা (ইন্ডিয়ান রেড স্করপিয়ো)। এই কাঁকড়াবিছার বৈজ্ঞানিক নাম হটেনটোটা টামুলাস। তোমরা কি জান, বড়ো কাঁকড়াবিছা এক-একবার যতটা পরিমাণ বিষ ঢালে, সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু-কাঁকড়াবিছাও ততটাই বিষ ঢালতে পারে! এর বিষে আছে নিউরোটক্সিন, কার্ডিয়োটক্সিন, নেফ্রোটক্সিন, হিমোলাইসিন, ফসফোডাইস্টেরাসিস, ফসফোলাইপেজ,

হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক। এই বিষ সহজে জলে বা তেলে মিশেও যেতে পারে।

একমাত্র আন্টার্কটিকা ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব মহাদেশে কাঁকড়াবিছা পাওয়া যায়। সারাবিশ্বে প্রায় ১৭৫০ প্রজাতির কাঁকড়াবিছা দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্যে অন্তত ২৫-টি প্রজাতির কাঁকড়াবিছার বিষে মানুষের পক্ষাঘাত ও মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যদিও বাকি প্রজাতির কাঁকড়াবিছা হুল ফোটালে সুস্থ সবল মানুষের কোনো মেডিকেল ট্রিটমেন্টের দরকার পড়ে না। তবে তোমরা একটা কথা মনে রেখো, নিজেকে বিপন্ন মনে না করলে কাঁকড়াবিছা কিন্তু হুল ফোটায় না। তাই বনের পথে যদি তাকে দেখতে পাও, তাহলে তাকে না মেরে বরং পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াই ভালো। অহেতুক একটি প্রাণীকে হত্যা করার কী দরকার!

কাঁকড়াবিছা কোথায় থাকতে বেশি পছন্দ করে, তা বলা মুশকিল। কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, সাধারণত মরুভূমি ও ওই ধরনের শুষ্ক আবহাওয়ায় কাঁকড়াবিছা বেশি দেখা যায়।

কাঁকড়াবিছা খুব দ্রুত যেতে পারে। তাই এদের ধরা বেশ কঠিন। এরা এদের লম্বা দুই দাঁড়ার সাঁড়াশি দিয়ে শিকার ধরে এবং ওই সাঁড়াশির চাপে তাকে প্রায় টুকরো করে ফেলে তার শরীরে হুল ফুটিয়ে বিষ ঢালে। ফলে তার শরীর অসাড় হয়ে যায়। তখন আর ওই শিকারি কাঁকড়াবিছার খাদ্যগ্রহণে কোনো অসুবিধা হয় না।

জান তো, এরা এক-একবারে অনেকটা করে খেতে পারে। কারণ, কাঁকড়াবিছার দেহে খাদ্য মজুত রাখার গ্রন্থি আছে। তোমরা জানলে অবাক হবে, যদি কখনো খাবারের অভাব হয়, তখন এরা এদের শরীরের বিশেষ ক্ষমতায় খাদ্য পরিপাক ব্যবস্থাকে ধীরগতিসম্পন্ন করে ফেলতে পারে! তখন খাবার হজম হতে দেরি হয়। তাই খাবার ছাড়াই এরা ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

স্ত্রী-কাঁকড়াবিছা এক-একবার ২০ থেকে ৪৫-টি শিশু-কাঁকড়াবিছার জন্ম দেয়। মজার ব্যাপার কী জান, জন্মের পর আমরা যেমন বাবা-মায়ের কোলে চেপে ঘুরে বেড়াই, তেমনি যতদিন-না তাদের দেহের খোলস শক্ত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শিশু-কাঁকড়াবিছা তাদের মায়ের পিঠে চেপেই ঘুরে বেড়ায়!

এরা এক-দু ইঞ্চি থেকে প্রায় নয় ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। সাধারণত কীটপতঙ্গ, মাকড়সা, আরশোলা, গুবরে পোকা ও ছোটোখাটো পোকা খেয়ে বেঁচে থাকে। তবে দু-একটি প্রজাতির কাঁকড়াবিছা ব্যাঙ, টিকটিকি ও অন্যান্য প্রাণীর মাংসও নাকি খায়।

কাঁকড়াবিছা কোথায় থাকতে বেশি পছন্দ করে, তা বলা মুশকিল। কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, সাধারণত মরুভূমি ও ওই ধরনের শুষ্ক আবহাওয়ায় কাঁকড়াবিছা বেশি দেখা যায়। আসলে এরা সব পরিবেশে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। তাই এদের কাঠের গুঁড়ির মধ্যে, পাথরের খাঁজে, স্তূপীকৃত মালপত্র, ঝোপঝাড় ও গাছের ডালেও দেখা যায়। তাই তোমাদের বাড়ির আশেপাশে কাঁকড়াবিছার দেখা পেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

কাঁকড়াবিছার বিষ শুধু যে ক্ষতিকারক, তা কিন্তু নয়। উন্নততর গবেষণায় দেখা গেছে, কয়েক ধরনের ক্যানসারের রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাতে এবং আর্থারাইটিসের চিকিৎসায় কাঁকড়াবিছার বিষ বেশ কার্যকরী। জেনে রেখো, দারুচিনি, পিপারমেন্ট, ল্যাভেন্ডার ও সিডার তেল কাঁকড়াবিছা একদম সহ্য করতে পারে না। তাই এগুলির তেল অন্য কোনো তেল বা জলের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করলে কাঁকড়াবিছার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া কাঁকড়াবিছার ফসিলের কার্বন ডেটিং, অর্থাৎ বয়স পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন যে-ফসিল (প্যারিয়োস্করপিয়ো ভেনাটর), তার বয়স নির্ধারণ করে জানা গেছে, কাঁকড়াবিছা এই পৃথিবীতে ৪৩ কোটি ৭০ লক্ষ বছর ধরে বসবাস করছে। অসম্ভব এদের জীবনীশক্তি। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন— কোনো কাঁকড়াবিছাকে সারারাত বরফের মধ্যে জমিয়ে রাখার পর সকালে তাকে রোদের মধ্যে রেখে দেখা গেল, একটু পরেই সে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে। হয়তো এই জন্যই এরা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে এত কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে!

দেহের অনন্য আকৃতির কারণে কাঁকড়াবিছা বা স্করপিয়ো চিত্রশিল্পে, উপকথায়, সিনেমায় ও বিভিন্ন দ্রব্যের ব্র্যান্ডেও জায়গা করে নিয়েছে। তা ছাড়া যাঁরা জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করেন, তাঁদের কাছে বৃশ্চিক (স্করপিয়ো) একটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি। তোমাদের মনে আছে, সত্যজিৎ রায়ের সেই বিখ্যাত সিনেমা ‘সোনার কেল্লা’র কথা? মনে পড়ে, সেখানে নকল ড. হাজরা ফেলুদাকে মারার জন্য তার বিছানায় সাংঘাতিক বিষধর কাঁকড়াবিছা ছেড়ে দিয়েছিল!

এবার তোমাদের কাঁকড়াবিছা নিয়ে একটা রূপকথার গল্প শুনিয়ে আজকের মতো ইতি টানি।

গ্রিক উপকথা অনুযায়ী, ক্রোনাস ও রিয়ার পুত্র পসাইডন ছিলেন সমুদ্রের দেবতা। সাগরের উত্তাল ঢেউ তাঁর ইশারায় ফুঁসে ওঠে, আবার তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তোমরা কেউ কেউ হয়তো দেবরাজ জিউসের নাম শুনেছ। পসাইডন হলেন তাঁর ভাই।

পসাইডনের পুত্র ওরিয়ন ছিল একজন অত্যন্ত রূপবান, শক্তিশালী ও নির্ভীক যোদ্ধা। কিন্তু সে ছিল খুব দাম্ভিক। একবার সে প্রতিজ্ঞা করল, এই পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তাদের সবাইকে সে মেরে ফেলবে। ফলে পৃথিবীর রক্ষাকর্তা দেবী গেইয়া ওরিয়নের এই আচরণে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। দেবী গেইয়া তো প্রাণীদেরও রক্ষক। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব তো তাঁরই! তাই তিনি দৈত্যাকার কাঁকড়াবিছা স্করপিয়োকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তিনি বললেন, “পৃথিবীর প্রাণীদের আজ সমূহ বিপদ। তুমি কি পারবে স্করপিয়ো, ওরিয়নকে মেরে এই পৃথিবীর প্রাণীদের রক্ষা করতে?” স্করপিয়ো রাজি হল।

দেবীর কথা রাখতে সে চলল ওরিয়নকে হত্যা করতে। দুই মহা শক্তিধরের মধ্যে জলে-স্থলে তুমুল যুদ্ধ হল। একসময় বাগে পেয়ে স্করপিয়ো তার বিশাল দুই দাঁড়া দিয়ে ওরিয়নকে জাপটে ধরল। তারপর বিষাক্ত হুল ফুটিয়ে তাকে অবশ করে দিল। আর তারপর, দাঁড়ার চাপে তাকে দু-টুকরো করে ফেলল। স্করপিয়োর দাঁড়ার আঘাতে ও বিষে একসময় মৃত্যু হল ওরিয়নের। খবর পেয়ে দেবী গেইয়া খুব খুশি হলেন। তার বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ স্করপিয়োকে তিনি রাতের আকাশে ঠাঁই দিলেন। আজও তাই বসন্তের রাতে দেখা যায়, স্করপিয়ো ওরিয়নকে তাড়া করছে। ■

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদশিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখেছেন

ফরিদা নাসরিন

ড্রোন

ড্রোন হচ্ছে এমন এক ধরনের বিমান, যা পাইলট ছাড়াই উড়তে পারে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গুঞ্জন। কারণ, বিমানটি ওড়ার সময় মৌমাছির মতো গুনগুন শব্দ করে। ড্রোন এখন ব্যবহার করা হচ্ছে নানা ক্ষেত্রে। যুদ্ধক্ষেত্রে, তথ্য সংগ্রহের কাজে, ফোটোগ্রাফি/ফুটেজ বা সিনেমার শুটিঙে এবং আরও হাজারো কাজে।

আজ যেসব ড্রোন দেখা যায়, সেসব কিন্তু রাতারাতি তৈরি হয়নি। ড্রোনের সঙ্গে মিলিটারি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কয়েক যুগের সম্পর্ক রয়েছে। মিলিটারি ব্যবস্থায় যেখানে মানুষের কাছে পৌঁছোনো দুর্গম, এমন সব স্থানে মনুষ্যবিহীন বিশেষ সুবিধার জন্য প্রথমদিকে ড্রোনের চিন্তাভাবনা করা হয়। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য রেডিয়ো ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হলে আকাশযানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক রাতারাতি পরিবর্তন আসে। পরে সামরিক বিভাগে ব্যবহারের জন্য ক্লাসিক ক্যামেরা এবং সেন্সরসমৃদ্ধ প্রথম মিলিটারি ড্রোন তৈরি করা হয়।

> দেখলাম আজারবাইজান আর আর্মেনিয়ার যুদ্ধে তুরস্কের বায়রাক্তার-টিবি২ ড্রোনের ভয়ংকর মারণক্ষমতা। আজারবাইজান বলতে গেলে তুর্কি ড্রোনের সাহায্যেই আর্মেনিয়াকে ধরাশায়ী করে ফেলল। ফলে এই যুদ্ধ আগের সব যুদ্ধের ধারণাকে আমূল পালটে দিয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তির উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে এখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা-সহ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন কোম্পানি ড্রোন নির্মাণ করছে। বর্তমানে গুগল, অ্যামাজনের মতো বড়ো কোম্পানি পণ্য পরিবহণ, যোগাযোগ রক্ষা, তথ্য পরিবহণ-সহ নানা কাজে সার্থকতার সঙ্গে ড্রোনকে কাজে লাগাচ্ছে। ফেসবুক আজ ড্রোনের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়ও আজকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ড্রোন।

বর্তমানে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা তাদের অফিস থেকেই বিভিন্ন ভবনের ছাদ এবং অন্যান্য উঁচু ভবন ড্রোনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ নজরদারির আওতায় রাখছে।

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, বনায়ন নজরদারি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা, শিকারির হাত থেকে অভয়ারণ্য রক্ষাসহ এই সম্পর্কিত নানা নজরদারির কাজে সফলভাবে ড্রোন বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন স্তরে নিরাপত্তাজনিত নজরদারি, সুরক্ষা, জরুরি নির্গমণসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা স্তরে বিভিন্ন কাজে ড্রোনের ব্যবহার উল্লেখ করার মতো। এ ছাড়া ব্যক্তিগত এবং পেশাদারি পর্যায়ে ছবি তোলা এবং ভিডিয়ো ধারণে ড্রোনের ব্যবহার একটি প্রচলিত বিষয়। ড্রোনের ব্যবহারে একদিকে যেমন বিভিন্ন খাতে মানুষের প্রয়োজন অনেক কমেছে, ঠিক তেমনি উল্লেখযোগ্য হারে ব্যয়ও সংকুচিত হয়েছে।

ড্রোন নানা কাজে মানুষকে নানা সুবিধা এনে দিয়েছে ঠিকই, তেমনি এর কিছু নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকিও রয়েছে। সব থেকে বিপদজনক দিকটি হচ্ছে— ব্যক্তিগত তথ্য চুরির আশঙ্কা। ঠিক এই কারণেই পৃথিবীর অনেক দেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ড্রোনের ব্যবহার আইনের মাধ্যমে সীমিত করা হয়েছে।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায় যুদ্ধের ক্ষেত্রেই প্রথম এর সূচনা। ১৯৫৯ সালে আমেরিকার বিমানবাহিনী প্রথম এই মনুষ্যবিহীন বিমান তৈরিতে হাত দেয়। ১৯৬৪ সালের ভিয়েতনাম যুদ্ধে টনকিন উপসাগরে প্রথম ব্যবহার হয় এই পাইলটবিহীন যুদ্ধবিমান। এরপর ১৯৭৩ সালে আমেরিকা স্বীকার করে, তারা ভিয়েতনাম যুদ্ধে ড্রোন ব্যবহার করেছে। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে সিরিয়ার মিসাইল ব্যাটারি যখন একের-পর-এক ইসরাইলি বিমানকে ধারেকাছে ভিড়তে দিচ্ছিল না, তখন এল প্রযুক্তির খেলা। তখন চমক দেখিয়ে ইসরাইল তৈরি করে ফেলে মনুষ্যবিহীন বিমান বা ইউএভি। এরপর থেকে শুরু হয়ে যায় ড্রোনের প্রচলন। ১৯৮২ সালের লেবানন যুদ্ধে ইসরাইল ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে ড্রোন। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার সেনাবাহিনী আরও অধিক মাত্রায় ব্যবহার করে এই ড্রোন।

ড্রোন যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে, তার নাম হচ্ছে ইউএভি (UAV)। যার পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Unmanned aerial vehicle। যার আছে দু-টি প্রকারভেদ, একটি সাধারণ ইউএভি ও অপরটি সামরিক ইউএভি। সাধারণ ইউএভিগুলোতে মূলত একটি ক্যামেরা, পাখা, আর কিছু সেন্সর থাকে। এগুলো ড্রোনকে আকাশে উড়তে ও নির্দিষ্ট পথে যেতে সাহায্য করে। তবে অবশ্যই সাধারণ ইউএভি হোক আর সামরিক ইউএভি, সবাইকেই রিমোটের সাহায্যে চালাতে হয়। অপর দিকে সামরিক ইউএভিগুলোতে থাকে ককপিট, স্পাই ক্যামেরা, লেজার, জিপিএস, সেন্সর, লাইটিং সেন্সর ইত্যাদি। সঙ্গে থাকছে অস্ত্র। তবে এর সমস্ত কিছু থাকে ইউএভিগুলোর নাকের কাছে, যার কারণে এরা অনেক বেশি দূরে যেতে পারে। আর এগুলোর জন্য অবশ্যই একটা রানওয়ে দরকার। ড্রোনের মূলত দু-টি অংশ। একটি হচ্ছে ড্রোন নিজে ও অপরটি হচ্ছে এর কন্ট্রোলার সিস্টেম। গ্রাউন্ড কন্ট্রোলার নির্দেশ দেয় আর সেটা উপগ্রহ হয়ে ড্রোনের কাছে পৌঁছে যায়। ড্রোন নির্দেশগুলো জেনে নিয়ে পর পর সেই কমান্ড অনুযায়ী কাজ করে। ঠিক একইভাবে ড্রোনও গ্রাউন্ড কন্ট্রোলারের কাছে তথ্য পাঠিয়ে থাকে। এই কাজগুলো করতে ড্রোনের সময় লাগে মাত্র ২ সেকেন্ড।

ড্রোন হচ্ছে বর্তমান যুগের সেরা আবিষ্কারের একটি, যেটা আজ আমরা নিজেদের প্রয়োজন বলি বা নিরাপত্তা— সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি। তবে এর ব্যাবহারিক গুরুত্ব সবথেকে বেশি যেন-বা যুদ্ধক্ষেত্রে। প্রতিপক্ষকে হামলার ছক থেকে শুরু করে হামলা করা পর্যন্ত সবকিছু ড্রোন দিয়ে হচ্ছে। যুদ্ধে ড্রোন প্রথমদিকে গোয়েন্দাগিরির কাজই করত। তারপর এল সরাসরি যুদ্ধে, অর্থাৎ আক্রমণে। আত্মঘাতী জঙ্গির মতো সেগুলো ছিল আত্মঘাতী ড্রোন। এমন ড্রোন ইসরাইলের বিস্তর আছে।

এখন আর আত্মঘাতী ড্রোনের কদর তেমন নেই। নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত আঘাত করে ফিরে আসতে সক্ষম এখনকার ড্রোন। ড্রোনকে আরও আধুনিক আর চৌকস করতে তার প্রযুক্তি নিয়ে নানা দেশ এখন গবেষণায় ব্যস্ত। সম্প্রতি আমরা একটা গোটা যুদ্ধ দেখলাম, যার পুরোটা প্রায় ড্রোন-নির্ভর। দেখলাম আজারবাইজান আর আর্মেনিয়ার যুদ্ধে তুরস্কের বায়রাক্তার-টিবি২ ড্রোনের ভয়ংকর মারণক্ষমতা। আজারবাইজান বলতে গেলে তুর্কি ড্রোনের সাহায্যেই আর্মেনিয়াকে ধরাশায়ী করে ফেলল। ফলে এই যুদ্ধ আগের সব যুদ্ধের ধারণাকে আমূল পালটে দিয়েছে।

কী হবে, কেউ জানি না। তবে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধ হতে পারে মনুষ্যবিহীন এক মারণখেলা।

আজারবাইজান-আর্মেনিয়া যুদ্ধের পর বলা হচ্ছে, এই বায়রাক্তার-টিবি২ ড্রোনই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়ংকর। তবে কোনো দেশই হাত গুটিয়ে বসে নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, রাশিয়া, এমনকী তুরস্ক, এমনকী আমাদের দেশ ভারতও ড্রোন-প্রযুক্তির আধুনিকীকরণে এখন ব্যস্ত। আরও ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রোন কীভাবে তৈরি করা যায়, তার চেষ্টায় দিনরাত সারাদুনিয়ার সমরাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ আর অ্যারোনটিক ইঞ্জিনিয়াররা মাথা ঘামাচ্ছেন।

দ্য বয়েলিং রিভার

এক আশ্চর্য নদী রয়েছে আমাদের গ্রহে, যার জলের তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ৮৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাত্র কয়েক সেকেন্ডে কোনো প্রাণীকে জীবন্ত সেদ্ধ করে ফেলতে সক্ষম। পা ফসকে পড়ে গেলেই ভয়ানক মৃত্যু। কোথায়? দক্ষিণ আমেরিকায়।

আমাজন নানা রহস্যে ঘেরা এক জঙ্গল। এর অনেক অংশই এখনও পর্যন্ত মানুষের অজানা। আমাজনের পেরু অংশের একদম মধ্যভাগে সবচাইতে ঘন জঙ্গলে আশ্চর্য এই ফুটন্ত নদীটি রয়েছে। আমাজনের মোট আয়তনের শতকরা ১৩ ভাগ রয়েছে পেরুতে। আর এই অংশটুকুই আমাজনের সবচেয়ে ঘন, রহস্যময় এবং ভয়ংকর অংশ। আমাজন জঙ্গাল এখন পর্যন্ত পৃথিবীর দুর্ভেদ্য জায়গা। আর স্বভাবতই এ-জায়গা নিয়ে অনেক রূপকথা বা অনেক অবিশ্বাস্য গল্প মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। আর এ-জঙ্গালের এমন দুর্ভেদ্যতার কারণে সেগুলো শুধুই গল্প, নাকি বাস্তব—তা বের করা প্রায় অসম্ভব। সেই অসম্ভবকেই বাস্তবে আনে আন্দ্রেজ বুজোর আবিষ্কার করা ফুটন্ত জলের নদী।

আন্দ্রেজ বুজোর শোনা রূপকথার গল্পটি ছিল এক হারিয়ে যাওয়া শহরের। মেক্সিকো এবং পেরুতে তৎকালীন স্প্যানিশ শাসকের সৈন্যরা শেষ ইনকা শাসককে হত্যা করে আমাজন জঙ্গালে সোনা খুঁজতে বের হয়। কিন্তু আমাজনের অপরিচিত পরিবেশে টিকে থাকা সোজা নয়। কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার পর তারা জঙ্গালের মানুষখেকো সাপ, বিষাক্ত ও ফুটন্ত জলের নদীর কথা মানুষদের জানায়। এই আশ্চর্য গল্প পেরুতে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু গল্পের আশ্চর্য নদী বাস্তবে থাকতে পারে, তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু এমনই অনেক প্রচলিত রূপকথার গল্পের মতো এই গল্প বাস্তবে রূপ নেবে, কে ভেবেছিল!

ছোটোবেলায় শোনা গল্পটি আন্দ্রেজ বুজোর চিন্তাধারায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে, যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়েও এ-নদীর কথা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। ভূপদার্থ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের সাউদার্ন মেথডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা আন্দ্রেজ বুজো পড়াশোনা চলাকালেই এ-নদীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানার চেষ্টা করেন। প্রায় দু-বছর তিনি এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ অনেকের মতামত জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু সবাই তাঁকে হতাশ করেন। কারণ, কোনো নদীর জল এমন মাত্রায় গরম হতে হলে আশেপাশে আগ্নেয়গিরির উপস্থিতি জরুরি। পেরুর যে-অংশে বুজো এমন নদীর উপস্থিতি দাবি করেছিলেন, তার আশেপাশে প্রায় ৪০০-৪৫০ মাইল পর্যন্ত কোনো আগ্নেয়গিরি ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবে সবাই এই রূপকথার নদীকে শুধুমাত্র একটি কল্পকাহিনি বলেই উড়িয়ে দেন। এবং ওই সময় রূপকথার নদী খোঁজার ব্যাপারটা অনেকটাই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় সবার সামনে। তিনিও তখন আশা ছেড়ে দেন।

কিন্তু চূড়ান্তভাবে এ-নদী নিয়ে গবেষণার সিদ্ধান্ত নেন পিএইচ.ডি. করার সময়। তাঁর গবেষণা দলের কাজের অংশ হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি জিয়োথার্মাল ম্যাপ তৈরি করেন গুগলের সাহায্যে, যেখানে আগের চেয়ে আরও ভালোভাবে ভূ-অভ্যন্তরস্থ তেল, গ্যাস, জলের প্রবাহ সম্পর্কে জানা যায়। যেহেতু পেরুতে খনিজ সম্পদ খোঁজা তাঁর অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল, তাই গল্পের সেই নদীর কথা মাথায় রেখেই তিনি পেরুর জন্য এমন একটি জিয়োথার্মাল ম্যাপ তৈরি করেন। দেখা যায়, আশেপাশে কোনো আগ্নেয়গিরি না থাকলেও আমাজনের কোনো কোনো ভূমির তাপমাত্রা রহস্যজনকভাবে অস্বাভাবিক হারে বেশি, যা বুজোর মনে আগ্রহের জন্ম দেয়। কারণ, হঠাৎ করে এমন অস্বাভাবিক হারে তাপমাত্রার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ছিল না।

কোনো এক ছুটিতে বাড়ি এসে তাঁর পরিবারকে এমন নদী থাকার সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞেস করলে তাঁর মা এবং পিসি তাঁকে অবাক করে দিয়ে জানান, এমন নদী তো আছে! শুধু তা-ই নয়, তাঁরা ওই নদী দেখেছেন বলে দাবি করেন, যা বুজোর কাছে বড়ো একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ২০১১ সালে পিসিকে নিয়ে আজব নদী খোঁজার কাজে বেরিয়ে পড়েন। একপর্যায়ে সেই নদীর তিনি খোঁজও পেয়ে যান। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

আন্দ্রেজ বুজো ছিলেন প্রথম ভূবিজ্ঞানী, যিনি এই আজব নদী খুঁজে পান। কিন্তু ওই নদী তিনিই সবার আগে খুঁজে পান, সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করবে নদীটির প্রাচীন নাম। অবাক করা এই নদীটির প্রাচীন নাম সানাই-টিমপিসকা, যার অর্থ সূর্যের তাপে ফুটন্ত। স্থানীয়রা সূর্যের তাপকে এই নদীর এমন উষ্ণতার কারণ বলে মনে করতেন। তার মানে, উত্তপ্ত নদীটি সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দারা অনেক আগে থেকে জানতেন, কিন্তু তা পৃথিবীর সামনে আসেনি। নদীটিকে স্থানীয় বাসিন্দারা পবিত্রভূমি ভেবে পুজোও করতেন। নদীর খোঁজ পেলেও সেখানে বুজোর গবেষণা চালানো সহজ ছিল না। স্থানীয় লোককাহিনি এবং পুরোহিতদের কারণে নদীর সম্পর্কে বাইরে প্রচার করা নিষিদ্ধ ছিল। নদীর পাড়ে বসবাস করে মায়ানতুয়াকু ও সাঞ্জুয়ারিয়ো হুইসটিন নামের দুই সম্প্রদায়।

এই দুই সম্প্রদায়কে ঘিরে অনেক লোককাহিনি প্রচলিত রয়েছে, যা স্থানীয়রা যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে আসছে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, মায়ানতু হল আমাজন জঙ্গালের সেই আত্মা, যার মাথা ব্যাঙের মতো, কিন্তু শরীর টিকটিকির মতো। হাত-পা আবার কচ্ছপের মতো। তাদের বিশ্বাস, এই মায়ানতু নামক আত্মা উপকারী। আবার ইয়াকু অর্থ জল। এই নদীর জলেই মায়ানতুর মতো শক্তিশালী আত্মাদের বসবাস। আর ধর্মযাজক বাদে অন্য মানুষ তাই ওই নদীতে যেতে ভয় পায়। এই ধর্মীয় আবেগ আর লোককাহিনির প্রতি স্থানীয়দের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই বাইরের পৃথিবী কোনোভাবেই এই নদীর ব্যাপারে জানতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আন্দ্রেজ বুজো মায়েস্ট্রো জোয়ান নামের এক ধর্মযাজকের সাহায্য নিয়ে নদীতে পৌঁছোন।

ফুটন্ত জলের এই আশ্চর্য নদী মূলত আমাজনের পেরু অংশের একদম

কেন্দ্রে বয়ে যাচ্ছে। লিমা থেকে পুকালপা নগরী আকাশপথে এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত। এটি পেরুর অন্যতম বৃহত্তম নগরী। এ-নগরী থেকে পাচিটা নদীতে যেতে সময় লাগে প্রায় দু-ঘণ্টা, এবং এ-নদী দিয়েই সেই বহুল আকাঙ্ক্ষিত বয়েলিং ওয়াটার রিভার বা ফুটন্ত জলের নদীতে পৌঁছোতে হয়। নদীতে গিয়ে আন্দ্রেজ রুজোর প্রথম ধাক্কা ছিল জলের তাপমাত্রা। জল যে এতটা উত্তপ্ত হবে, ধারণার বাইরে ছিল। প্রথমেই তিনি থার্মোমিটারে জলের তাপমাত্রা পরীক্ষা করেন, যা ছিল প্রায় ২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো। একেবারে সেদ্ধ করার মতো গরম নয়, কিন্তু কোনো প্রাণীকে মারার জন্য যথেষ্ট।

নদীতে বিভিন্ন ছোটো ছোটো প্রাণী— যেমন ব্যাঙ, সাপ মরে ভেসে যেতে দেখেন আন্দ্রেজ রুজো। তাঁর মতে কোনো প্রাণী নদীর জলে পড়ার পরেও সাঁতরে পার হতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রথমেই প্রচণ্ড উত্তপ্ত জলে তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার কারণে সে দৃষ্টিশক্তি হারায়। আস্তে আস্তে বাইরের চামড়া সেদ্ধ হতে শুরু করে, তারপর মুখের মাধ্যমে শরীরের ভেতরের অঙ্গে গরম জল প্রবেশ করে। ওই প্রাণীর লিভার, কিডনি-সহ অভ্যন্তরীণ প্রায় সব অঙ্গ অকেজো হয়ে পড়ে আস্তে আস্তে, যার কারণে সে আর সাঁতরাতে পারে না। শক্তিহীন হয়ে একসময় প্রাণীটির মৃত্যু হয়।

এই উত্তপ্ত নদীটি আমাজন জঙ্গলের মাঝে বয়ে যাওয়া নদীর একটা অংশ মাত্র। পুরো নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ কিলোমিটার, কিন্তু এর মাঝে প্রায় ৬.২৪ কিলোমিটার অংশ উত্তপ্ত। বিশেষ করে শুকনো মরসুমে এতটাই গরম হয়, যা যেকোনো প্রাণীকে মেরে ফেলতে সক্ষম। এখানকার তাপমাত্রা ২৭ থেকে ৯৪ ডিগ্রির মাঝে ওঠানামা করে। নদীর জলের তাপমাত্রা বছরের সেই সময়টাতেই একটু সহনীয় পর্যায়ে যায়, যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। স্থানীয় মানুষ এই নদীর জল চা তৈরি বা অন্যান্য রান্নার কাজে ব্যবহার করে।

কিন্তু জল উত্তপ্ত হওয়ার কারণ কী? আন্দ্রেজ রুজো ওই নদী সম্পর্কে কিছু অবাক করার মতো তথ্য পান। তাঁর গবেষণা দলের মতে, পৃথিবীটাকে একটা মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করলে মানবদেহের রক্তনালী, শিরা-উপশিরার মতো ভূ-অভ্যন্তরেও অনেক উত্তপ্ত পাথর ও উত্তপ্ত জলের প্রবাহ বিদ্যমান— যেগুলো পৃথিবীর শিরা-উপশিরা বলে ধরা যায়। মানবশরীরের শিরা-উপশিরায় কোনো ছিদ্র হলে যেমন রক্ত বের হয়, ঠিক তেমনি ভূ-অভ্যন্তরেও এসব শিরা-উপশিরায় মাঝে মাঝে এমন ছিদ্র দেখা গেলে, উত্তপ্ত পাথর ও জল ভূপৃষ্ঠে উঠে আসে। আর তখনই উত্তপ্ত জলের

নদীর মতো বিভিন্ন ভূ-তাপমাত্রার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এই নদীর জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, জল মূলত বৃষ্টি থেকে আসে। কিন্তু রুজোর মতে, বৃষ্টির জল অনেক দূরের আন্দিজ পর্বতের কাছাকাছি নদীর উৎসের কাছের। লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ার মাঝে নদীর কিছু জল ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভূ-তাপীয় শক্তির দ্বারা উত্তপ্ত হয়ে আস্তে আস্তে আবার নদীর মূলধারায় ফিরে আসে উত্তপ্ত জলরূপে। আর এ থেকেই সৃষ্টি উত্তপ্ত নদীর। তার মানে এই নদীর উত্তপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এক বৃহৎ হাইড্রোথার্মাল সিস্টেম জড়িত আছে, যা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। রুজো স্পেনসার ওয়েলস এবং জনাথন এইসেন নামের আরও দু-জন জীববিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করেন, যাঁরা ওই নদীতে বা নদীর আশেপাশে বসবাস করা সমস্ত প্রাণীর জিনোম নিয়ে গবেষণা করেন এবং দেখতে পান, তাদের মাঝে উচ্চ-তাপমাত্রায় বেঁচে থাকার এক ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

রুজো নদীটির কথা দুনিয়াকে জানানোর জন্য ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিকে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার ফলে বাইরের পৃথিবীর মানুষ নদীটি সম্পর্কে জানতে পারে। এরপর তিনি ২০১৪ সালে টেড টকে তাঁর গবেষণার প্রায় সমস্ত তথ্য-উপাত্ত মানুষের সামনে তুলে ধরেন। এই নদীর অনেক রহস্যই এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের অজানা রয়ে গেছে।

আন্দ্রেজ রুজো এখন পর্যন্ত নদীটিকে ঘিরে তাঁর গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু এখন তিনি নদী সম্পর্কে জানার চেয়ে নদীটি রক্ষার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি এই নদী নিয়ে তাঁর গবেষণাপত্র ততদিন বাইরে প্রকাশ করেননি, যতদিন পর্যন্ত পেরু সরকার নদীটি সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নিয়েছেন। তা ছাড়াও রুজো এ-নদীর উপর 'দ্য বয়েলিং রিভার' নামে একটি বই লেখেন। বইটিতে তিনি নদীটি নিয়ে তাঁর সমস্ত গবেষণা এবং ধারণা তুলে ধরেছেন।

বর্তমানে এই জায়গাটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হলেও এর দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এটি এখনও পৃথিবীর মানুষের কাছে খুব একটা পরিচিত নয়। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হল, নদীটিকে তার নিজ বৈশিষ্ট্যে টিকিয়ে রাখা। আমাজন জঙ্গলের অবাধ বন-নিধনের ফলে নদীটির অস্তিত্বই হুমকির মুখে। আশ্চর্য নদীটির রহস্য সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই জানা বাকি আমাদের। এর মাঝে যদি মানুষের কারণে রূপকথার মতো এ-নদী হারিয়ে যায়, তাহলে হয়তো হেরে যাবে রূপকথার গল্পেরই মতো অদম্য এক বিজ্ঞানীর আবেগ ও অনুসন্ধান। প্রকৃতির দান প্রকৃতির কোলেই নিশ্চিন্ত মনে বয়ে যাক হাজার বছর, এটাই চান লাখো-কোটি পরিবেশপ্রেমী আর আমাদের আন্দ্রেজ রুজো নামে রূপকথার চরিত্রের মতোই এক তরুণ ভূবিজ্ঞানী। ■

এটি নানান টুকরো টুকরো বিভাগের সমন্বয়। দেশ, মহাকাশ— কী নেই! রত্নে ভরা আলিবাবার গুহা যেন।

দেশ

আলবেনিয়া নামটির উৎস সন্ধান করলে পৌঁছে যেতে হবে মধ্যবর্গীয় ল্যাটিন ভাষার শব্দভাণ্ডারের কাছে। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ভৌগোলিক টলেমি যিশু খ্রিস্টের জন্মের ১৫০ বছর আগে পৃথিবীর যে-মানচিত্র সংকলন করেছিলেন, তাতে অ্যালবেনোপলিস নামে একটি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই অ্যালবেনোপলিস নগর ও তার আশপাশের জনপদটিই বর্তমানে আলবেনিয়া। মধ্যযুগে এই জনপদটি অ্যালবানোন নামে পরিচিত ছিল।

বর্তমানে গোটা বিশ্বের কাছে আলবেনিয়া নামে পরিচিত হলেও দেশটির বাসিন্দারা একে শিকিপেরি বলে ডাকে।

দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে ছবির মতো সুন্দর একটা ছোট্ট দেশ আলবেনিয়া। ভূমধ্যসাগর, আড্রিয়াটিক সাগর ও আয়োনীয় সাগর দিয়ে তিন দিক ঘেরা এ-দেশটির প্রতিবেশী দেশগুলি উত্তর-পশ্চিমে মন্টিনিগ্রো, উত্তর-পূর্বে কসোভো, পূর্বে উত্তর ম্যাসিডোনিয়া, দক্ষিণে গ্রিসের সাথে আলবেনিয়ার জলভাগের সীমানা রয়েছে।

আলবেনিয়া দেশটি খুবই ছোটো আয়তনের। পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলির মধ্যে আয়তনের তুলনা করলে আলবেনিয়ার স্থান ১৪০ নম্বরে আসবে। আয়তন মাত্র ২৮৭৪৮ বর্গকিলোমিটার, যা প্রকৃতপক্ষে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তিন ভাগের একভাগ মাত্র।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকেই আলবেনিয়া দখল করেছে বিভিন্ন জাতি। এবং তাদের সংস্কৃতি, রীতি-নীতির ছাপ রেখে গেছে এই দেশটির জল-হাওয়ায়। ইলিরিয়ান, থ্রাসিয়ান, গ্রিক, রোমান, বাইজানটিয়ান, অটোমান, ভেনেসীয় পৃথিবীর বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যগুলোর কোনো-না-কোনো সময় শাসনস্থল ছিল আলবেনিয়া।

শিকিপেরি শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে আলবেনীয় ভাষায়, ইগলের সন্তান এবং ইগলের দেশ।

আলবেনিয়ায় মানবজাতির চিহ্ন হদিশ করলে সূত্র মিলবে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের। মধ্য ও প্রাচীন প্রস্তর যুগে নিয়ালডারথ্যাল মানুষদের বসতি ছিল বর্তমান আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানার কাছাকাছি মাউন্ট দাজত ও জারে এলাকায়।

৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। পূর্ব ও পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। ৬০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে প্রচুর সংখ্যায় স্লাভ জনজাতির মানুষ দানিয়ুব নদী পার হয়ে আলবেনিয়ায় বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। ১১৯০ সালে প্রোগোল নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়, যিনি আলবেনিয়া শাসন করতেন। প্রোগোল নিজেকে পরিচয় দিতেন লর্ড অফ ক্রুজা নামে। প্রোগোলের মৃত্যুর পর আলবেনিয়ার শাসনভার চলে যায় আলবেনীয় গ্রিকদের হাতে। তারা ত্রয়োদশ শতক অবধি রাজত্ব করে। এরপর আলবেনিয়ায়

কোনো শক্তিশালী শাসক ছিল না। বিভিন্ন ছোটো ছোটো রাজবংশ বা সামন্তপ্রভু— যেমন বালসা, থোপিয়া, মুজুকারা শাসন চালায়। পঞ্চদশ শতকে এই দুর্বল আলবেনিয়া আক্রমণ করে অটোমান তুর্কিরা দখল করে নেয়। তারপর চারশো বছর আলবেনিয়া শাসন করে অটোমান শাসকরা। ১৯১২ সালে ২৮ নভেম্বর আলবেনিয়া স্বাধীন হয় অটোমান সাম্রাজ্য থেকে। যদিও এই স্বাধীনতা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আলবেনিয়া দখল করে ইতালি। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত আলবেনিয়া ইতালির দখলে ছিল। ১৯৪৩-এর পর আলবেনিয়ার দখল নেয় জার্মানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে যখন জার্মানি হেরে যেতে থাকে তখন তারা আলবেনিয়া ছেড়ে চলে যায়। এই অবস্থায় আলবেনিয়ায় শুরু হয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে। ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্টরা গৃহযুদ্ধে জয় পায়। সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে এনভের হোক্সার নেতৃত্বে আলবেনিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে কমিউনিস্ট পার্টি। সোভিয়েতের অনুকরণে নিজেদের দেশকে গড়ে তুলতে পরিকল্পনা করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। দ্রুত দেশে কলকারখানা গড়ে ওঠে, নতুন নতুন শহর তৈরি হয়, রেলপথের বিস্তার হয়, চাষের জমিতে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ চালু হয়। এইসব পদক্ষেপের ফলে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাক্ষেত্রে দারুণ সাফল্য আসে, দেশ একশো শতাংশ সাক্ষরতায় পৌঁছোয়। এই সময়কার পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশের জাতীয় আয় প্রায় ৫৬ শতাংশ বাড়ে।

এতসব উজ্জ্বল দিকের পাশাপাশি কয়েকটি অন্ধকার দিকও ছিল। বর্তমানে আলবেনিয়া একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সেখানে সমস্ত ধর্মের মানুষের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু কমিউনিস্ট শাসনাধীন আলবেনিয়ায় কোনো ধর্ম পালন করার অধিকার ছিল না। সকল ধর্মের ধর্মস্থানগুলি জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ, এনভের হোক্সা পরিচালিত সরকারের নীতি ছিল মানুষকে বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ধর্মের সংস্কার মুক্ত করতে হবে। ১৯৬৭ সালে আলবেনিয়াকে পৃথিবীর প্রথম নাস্তিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সময়ে যে-মানুষেরা ধর্ম পালন করতে চাইত, তাদের ওপর প্রচণ্ড নিপীড়ন চালানো হত। ১৯৯১ সালে আলবেনিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হওয়ার পর দেশে আবার ধর্মচর্চা করার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে আলবেনিয়ায় সব ধর্মের মানুষেরা সমান স্বাধীনতায় নিজধর্ম পালন করতে পারে। বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস তাঁর আলবেনিয়া সফরের সময় এখানকার সমস্ত ধর্মের মানুষের মিলেমিশে থাকার খুব প্রশংসা করেছেন।

আগেই লিখেছি আলবেনিয়া খুবই ছোটো দেশ, পশ্চিমবঙ্গের তিন ভাগের একভাগ মাত্র। গোটা দেশটি অসংখ্য ছোটো-বড়ো পাহাড়ে ও হ্রদে ভর্তি। স্কোডার হ্রদ দক্ষিণ ইয়োরোপের সবচেয়ে বড়ো হ্রদ, আলবেনিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ওরহিদ হ্রদ ইয়োরোপের প্রাচীনতম হ্রদের একটি, সেটিও আলবেনিয়ায় অবস্থিত। ইউনেস্কো ওরহিদ হ্রদটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আলবেনিয়া ছোটো দেশ হলেও এর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। দেশের উত্তরে আল্পস পর্বতমালা। এই অংশে আবহাওয়া শীতল ও আর্দ্র। আড্রিয়াটিক ও আয়োনিয়ান সাগর-তীরবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ। ১৯৭৩ সালে কুকোভ বলে একটি গ্রামের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা রেকর্ড অনুযায়ী পাওয়া যায় ৪৩.৯ ডিগ্রি, আবার ২০১৭ সালে লিবরাঝদ এলাকার একটি গ্রামে শীতকালে তাপমাত্রা ছিল -২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে এই অঞ্চলের জলবায়ুর একই অঙ্গে বিচিত্র রূপ।

আলবেনিয়া আর্থিকভাবে যথেষ্ট সমৃদ্ধ দেশ। রাজধানী তিরানা এবং ডারেস দেশের প্রধান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। আলবেনিয়ার অর্থনীতি পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্পের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়াও ইলেকট্রনিক্স, মাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, বস্ত্রশিল্প, সিমেন্টশিল্প এ-দেশে সমৃদ্ধ। ট্যাকি অয়েল, আলব পেট্রোল— এই পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলোর নাম দুনিয়া জোড়া। চাষবাসেও এ-দেশ পিছিয়ে নেই। ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি বলে আবহাওয়ার সুবিধা থাকায় প্রচুর ফলের চাষ হয়— আপেল, অলিভ, আঙুর, লেবু, অ্যাপ্রিকট, পিচ। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে কার্প, ট্রাউট, সি-ব্রিম মাছ যথেষ্ট পাওয়া

যায়। যদিও মৎস্যশিল্প সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ২০২০-র জনগণনা অনুযায়ী আলবেনিয়ার জনসংখ্যা ২৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯৫৫ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৫৯ জন লোক বাস করেন। জনসংখ্যা এত কম হলেও বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মানুষের মধ্যে রয়েছেন গ্রিক, ম্যাসিডোনিয়ান, মন্টেনিগ্রিয়ান, সার্ব, রোমা, মিশরীয়, বুলগেরিয়ান।

আলবেনিয়ার অফিসিয়াল ভাষা আলবেনীয়। দেশের বেশিরভাগ মানুষ এই ভাষাতেই কথা বলেন। এ ছাড়াও দেশে প্রচলিত ভাষাগুলি হল আরমেনিয়ান, সার্বিয়ান, বসনিয়ান, ম্যাসিডোনিয়ান।

আলবেনিয়ার মোট জনসংখ্যার ৫৮ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, ১৭ শতাংশ খ্রিস্টান। আলবেনিয়া দেশটি তাদের সংবিধানে দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আলবেনিয়ার মানুষের কাছে সোনালি ইগল পবিত্র প্রতীক। তাদের জাতীয় পতাকায় দু-মাথাওয়ালা ইগলের ছবি আছে। দেশের মানুষজন নিজেদের ইগলের সন্তান বা শিকিপেরি বলতে ভালোবাসেন। বাইজানটিয়ান অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনে থাকার জন্য আলবেনিয়ার সংস্কৃতিতে ইসলামীয় ও খ্রিস্টান সংস্কৃতির মিশেল দেখা যায়।

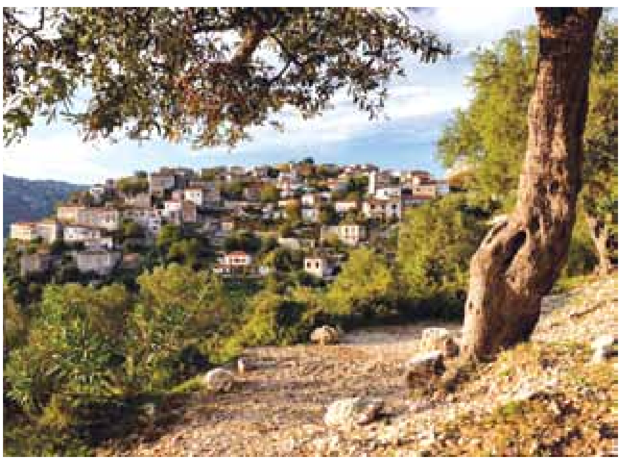

চাষবাসেও এ-দেশ পিছিয়ে নেই। ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি বলে আবহাওয়ার সুবিধা থাকায় প্রচুর ফলের চাষ হয়— আপেল, অলিভ, আঙুর, লেবু, অ্যাপ্রিকট, পিচ। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে কার্প, ট্রাউট, সি-ব্রিম মাছ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বাইজানটানীয় আমলে গড়ে ওঠা দুর্গ, চার্চ, চার্চের গায়ে আঁকা ফ্রেসকো, মুর‍্যাল দেখার জন্য প্রচুর পর্যটকের ভিড় হয়। আলবেনিয়ার দক্ষিণ অংশে বেরাট ও জিরোকাস্টার অঞ্চলে অটোমান আমলের মুসলমান স্থাপত্য দেখতে পাওয়া যায়।

আলবেনীয়দের খুব কফির নেশা। মানুষ-পিছু কফিহাউসের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে আলবেনিয়ায় সবচেয়ে বেশি। ফুটবল, বাস্কেটবল, রাগবি, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতি এই দেশের মানুষের প্রিয় খেলা।

অতনুমিথুন মণ্ডল

তারায় তারায়

প্রসিয়োন বা সরমা

গৃহবন্দি জীবন ক্লান্তি আনে, মানসিক উদ্‌বেগ বাড়িয়ে তোলে। এর থেকে বাঁচতে একটা কাজ তোমরা করতে পারো। সন্ধ্যে হলেই রোজ চলে যাও ছাদে। রাতের আকাশ চোখ ভরে দেখো। চেনা তারাদের, তাদের সম্পর্কে আরও বেশি করে জানার চেষ্টা করো। দেখবে সব উদ্‌বেগ হাওয়ার মতো মিলিয়ে গিয়ে পড়ে থাকবে শুধু অনাবিল আনন্দ।

কালপুরুষ আমাদের খুব পরিচিত একটা তারা। সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম আকাশে চোখ রাখলে খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে এই তারামণ্ডলটিকে। কালপুরুষের পূর্ব দিকে তোমরা যদি তাকাও চোখে পড়বে খুব উজ্জ্বল একটা তারা, নাম লুব্ধক বা সিরিয়াস। লুব্ধক যে-তারামণ্ডলে আছে, তার নাম ক্যানিস মেজর বা বড়ো কুকুরমণ্ডল। বড়ো কুকুরমণ্ডল থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল কিছু তারা দিয়ে তৈরি ছোটো কুকুরমণ্ডল বা ক্যানিস মাইনর তারামণ্ডল। এই তারামণ্ডলে অল্প উজ্জ্বল হলেও একটি তারা চোখে পড়বে, নাম প্রসিয়োন বা সরমা।

প্রসিয়োন তারা আসলে একটি তারা নয়, এটি একটি বাইনারি স্টার সিস্টেম। অর্থাৎ দুটি তারা, প্রসিয়োন-এ এবং প্রসিয়োন-বি-র দ্বারা তৈরি। এই তারাদুটি একে অপরের চারদিকে ক্রমাগত চক্কর দেয়। প্রসিয়োন রাতের আকাশে নবম উজ্জ্বলতম তারা।

প্রসিয়োন-এ একটি এফ-টাইপ মেইন সিকোয়েন্স তারা। তারাদের কেন্দ্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় কোর। এই কোরে জ্বালানি হিসেবে থাকে হাইড্রোজেন। প্রচণ্ড তাপে হাইড্রোজেনরা পরস্পরের সাথে জুড়ে জুড়ে তৈরি করে হিলিয়াম এবং আরও বেশি তাপ উৎপন্ন করে, তারাদের মধ্যেকার জ্বালানি খরচ হওয়ার এটাই পদ্ধতি। প্রসিয়োনের কোরে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে প্রসিয়োন-এ একটি প্রায়-দানব (Sub-gianté) তারায় পরিণত হয়েছে।

প্রসিয়োন-এ সূর্যের ভরের প্রায় ১.৫ গুণ এবং এর ব্যাস সূর্যের ৭ গুণ। প্রসিয়োন-বি একটি সাদা দানব তারা। যদিও এই তারাটির নামকরণ করার অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা এই তারাটিকে আকাশে চিহ্নিত করেছিলেন। জার্মান জ্যোতির্বিদ ফ্রেডরিক বেসেল ১৮৪৪ সালে প্রসিয়োন-বি-র কক্ষপথ সংক্রান্ত কিছু তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে জন মার্টিন স্কাবেরলে এটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে আকাশে এর অবস্থান জানান।

প্রসিয়োন শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রিক শব্দ প্রকিয়োন থেকে। যার অর্থ কুকুরের সামনে। যেহেতু আকাশে এই তারাটি লুব্ধকের কাছে অবস্থিত এবং লুব্ধককে কুকুর হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, তাই এই নাম। গ্রিক পুরাণ পড়লে জানা যাবে প্রসিয়োন বলে একটি কুকুর ছিল এরিগনে নামে এক

ছোটো মেয়ের। মিশর ও ব্যাবিলন এই দুই প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন সাহিত্যে প্রসিয়োনের উল্লেখ আছে। ব্যাবিলনীয় পুরাণকাহিনিতে প্রসিয়োনকে নানগার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নানগার একজন ছুতোরমিস্ত্রি, যিনি মহাকাশ তৈরি করেছিলেন। সংস্কৃতে প্রসিয়োনকে সরমা বলা হয়। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী সরমা হল দেবতাদের পোষা একটি মেয়েকুকুর। ঋগ্‌বেদেও সরমা একটি কুকুর হিসেবে উল্লেখিত আছে। সুতরাং এখানেও কিন্তু সেই কুকুরের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসছে।

ম্যাসিডোনিয়ান লোকগাথায় লুব্ধক ও সরমাকে বলা হয়েছে ভলসি বা নেকড়ে, যারা কালপুরুষকে পাহারা দিচ্ছে। মধ্যযুগে আরব জ্যোতির্বিদরা প্রসিয়োনকে আল-সিয়ারা বা এলগোমাইসা নামে চিহ্নিত করেন, পরবর্তী সময়ে ইয়োরোপে এই তারাটি পরিচিত হয় আগ্লোমেইজা নামে, যা এর আরবি নামটিরই বিকৃত উচ্চারণ। তুরস্কের লোকেরা প্রসিয়োনকে বলতেন

প্রসিয়োন শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রিক শব্দ প্রকিয়োন থেকে। যার অর্থ কুকুরের সামনে। যেহেতু আকাশে এই তারাটি লুব্ধকের কাছে অবস্থিত এবং লুব্ধককে কুকুর হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, তাই এই নাম।

বুমেইমা। হাওয়াই দ্বীপের লোকেরা মনে করতেন প্রসিয়োন তাদের সমুদ্রে নৌকো চালানোর সময় সাহায্য করে।

ইনুইট উপজাতির লোকগাথায় একটা মোটা কুঁড়ে লোকের কাহিনি আছে, যে কোনোদিন শিকার করতে যেত না। সে লুকিয়ে লুকিয়ে তার দলের অন্যদের শিকার করে আনা খাবার চুরি করত। তাই সবাই মিলে ঠিক করল মোটা কুঁড়ে লোকটাকে শাস্তি দেবে। সবাই তাকে বলল শীতে জমে বরফ হয়ে যাওয়া সমুদ্রের উপর গিয়ে দাঁড়াতে। সেখানে দাঁড়াতেই তার শরীরের চাপে বরফ ভেঙে মোটা লোকটি সমুদ্রে তলিয়ে গেল। মোটা কুঁড়ে লোকটির নামটির উচ্চারণ খুব দাঁতভাঙা। নাম তার সিকুলিয়ার-সিউজুইট টুক। ইনুইটরা প্রসিয়োনকে মনে করে সিকুলিয়ার-সিউজুইটটুক, শীতের শুরুতে আকাশে যখন প্রসিয়োন ওঠে, তার রং থাকে লাল। এই লাল রংকে তারা কল্পনা করে গল্পকথার ওই মোটা বেঁটে লোকটার মৃতদেহের রক্ত।

অতনুমিথুন মণ্ডল

সবজান্তা

জা নু য়া রি ক থা

১৯ জানুয়ারি ১৮০৯ সালে জন্ম যুগান্তকারী কবি ও গদ্যকারের। তিনি এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe)। একজন মার্কিন কবি, ছোটোগল্পকার, সম্পাদক, সমালোচক এবং যুক্তরাষ্ট্রের রোমান্স আন্দোলনের অন্যতম নেতা। বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী এই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সারাজীবন কাটে নানারকম যন্ত্রণা, আর্থিক দৈন্যদশা ও মানসিক অস্থিরতার মধ্যে। কুড়ি বছর বয়স হবার আগেই তিনি সাহিত্যরচনা শুরু করেন। কাটিয়েছেন অসংযমী জীবন। মৃত্যুর এক বছর আগে ঘুমের বড়ি খেয়ে একবার আত্মহত্যারও প্রয়াস পান। অন্যদিকে এতসবের মধ্যেও কয়েকটি গভীর আবেদনময় কবিতা ও ব্যতিক্রমধর্মী ছোটোগল্প রচনা করে শুধু মার্কিন সাহিত্যভুবনে নয়, বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে নিজের জন্য একটি গৌরবমণ্ডিত স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে 'হেলেনের প্রতি', 'স্বপ্ন', 'ইস্রাফিল', 'দাঁড়কাক', 'অ্যানাবেল লি' প্রভৃতি। 'দ্য রেভেন' বা 'দাঁড়কাক' কবিতাটি রোম্যান্টিকতা, মোহন সুরেলা ছন্দোময়তা ও তার রহস্যময় পরিমণ্ডলের জন্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পো তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটোগল্পে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রহস্যময়, ভূতুড়ে, মৃত্যুর গন্ধমাখা, খুনখারাপিতে ভরা, আতঙ্কতাড়িত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। গোয়েন্দাগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। উপরি-উক্ত ধারার রচনার মধ্যে 'আমন্তিলাডোর পিপা', 'কালো বিড়াল', 'রু মর্গের হত্যাকাণ্ড' এবং 'চুরি যাওয়া চিঠি' তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। পো-র উচ্চমানের রচনাশৈলী এবং প্রতীকবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন

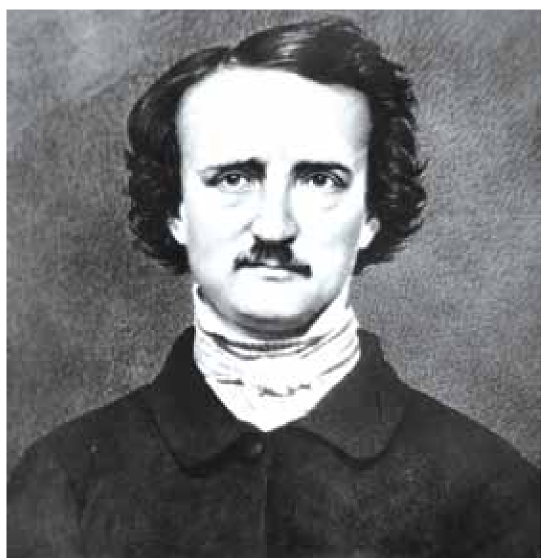

আইরিশ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস ও ফরাসি কথাসাহিত্যিক মোপাসাঁ এবং পল ভালেরি। বিশেষ করে দুই ভুবনবিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক শার্ল বোদলেয়ার এবং ফিয়োদর দস্তয়েভস্কি তাঁদের রচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন এই স্বল্পজীবী স্রষ্টার বিচিত্র রচনা থেকে। আজও পো-র সাহিত্যকর্ম সাধারণ পাঠক ও বিদগ্ধ সমালোচকের কাছে সমাদৃত হচ্ছে। তাঁর সাহিত্যের মতো এডগার অ্যালান পো-র মৃত্যুও রহস্যজনক। দিনটি ছিল অক্টোবরের ৭ তারিখ ১৮৪৯।

ফে ব্রু য়া রি ক থা

যাকে সারাদুনিয়া চেনে চার্লস ডিকেন্স নামে, তাঁর পুরো নাম চার্লস জন হাফ্যাম ডিকেন্স (Charles John Huffam Dickens)। জন্ম ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখ। সালটি ছিল ১৮১২। ছিলেন উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তাঁকে ভিক্টোরীয় যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে মনে করা হয়। ডিকেন্স জীবদ্দশাতেই তাঁর পূর্বসূরী লেখকদের তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৃত্যুর পরও তাঁর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, ডিকেন্স ইংরেজি সাহিত্যে প্রবাদপ্রতিম বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন।

তাঁর অধিকাংশ রচনাই পত্র-পত্রিকায় মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হত। এই পদ্ধতিতে রচনাপ্রকাশকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনেও ডিকেন্সের কিছু অবদান আছে। অন্যান্য লেখকগণ ধারাবাহিক কিস্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়গুলি রচনা করে যেতেন। এই পদ্ধতিতে উপন্যাস রচনার ফলে তাঁর উপন্যাসগুলির গল্পে একটি বিশেষ ছন্দ দেখা যেত। অধ্যায়গুলির শেষটুকু হত রহস্যময়, যার জন্য পাঠকেরা পরবর্তী কিস্তিটি পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকতেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসগুলি এতই জনপ্রিয় যে, এগুলি কখনোই আউট-অফ-প্রিন্ট হয়ে যায়নি। লিয়ো তলস্তয়, জর্জ অরওয়েল, জি কে চেস্টারটন প্রমুখ লেখকবৃন্দ ডিকেন্সের রচনার বাস্তবতাবোধ, রসবোধ, গদ্যসৌকর্য, চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা ও সমাজসংস্কার-চেতনার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে হেনরি জেমস, ভার্জিনিয়া উলফ প্রমুখ লেখকবৃন্দ ডিকেন্সের রচনার বিরুদ্ধে ভাবপ্রবণতা ও অবাস্তব কল্পনার অভিযোগও এনেছেন। সাহিত্যিক জীবনে তিনি অনেকগুলো বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করে গিয়েছেন, যেগুলো বিশ্বসাহিত্যে মাইলফলক হয়ে আছে। যেমন 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'আ টেল অব টু সিটিজ', 'অলিভার টুইস্ট', 'দি ওল্ড কিউরিয়াসিটি শপ' ইত্যাদি। অমর এই লেখকের পার্থিব মৃত্যু হয় ৯ জুন ১৮৭০ সালে।

মা র্চ ক থা

আমরা যেটাকে আইফেল টাওয়ার বলি, ৩১ মার্চ ১৮৮৯ সালে সেটার নির্মাণকাজ শুরু হয়। ফরাসিতে এই টাওয়ারটি লা তুর ইফেল। প্যারিসে অবস্থিত সুউচ্চ এই লৌহকাঠামোটি ফ্রান্সের সর্বাধিক পরিচিত প্রতীক। প্রধান নির্মাতা গুস্তাভো আইফেল। তাঁর নামেই ভুবনবিখ্যাত টাওয়ারটির নামাঙ্কিত। ৩২০ মিটার তথা ১০৫০ ফুট উচ্চতার এই টাওয়ারটি ছিল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী ৪০ বছর যাবৎ পৃথিবীর উচ্চতম টাওয়ার। গুস্তাভো আইফেল মূলত রেলের জন্য সেতুর নকশা প্রণয়ন করতেন এবং টাওয়ারটি নির্মাণে তিনি সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। বিশাল এই নির্মাণযজ্ঞে ১৮,০৩৮ খণ্ড লোহার বিভিন্ন আকৃতির ছোটো-বড়ো কাঠামো জুড়ে জুড়ে এই টাওয়ারটি তৈরি হয়েছে। কর্মযজ্ঞে অংশ নিয়েছিলেন ৩০০ শ্রমিক। এটা ছিল একসময় পৃথিবীর সর্বোচ্চ টাওয়ার। নিউ ইয়র্কে ক্রাইসলার হাউস তৈরির পর আইফেল টাওয়ার পৃথিবীর সর্বোচ্চ কাঠামোর মর্যাদা হারায়।

১৯১০ সালে ফাদার থিয়োডোর উলফ টাওয়ারের পাদদেশ এবং চূড়ার বিকিরিত শক্তি পরিমাপ করেন, যা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং কসমিক রশ্মি (Cosmic Ray) তখনই প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

প্যারিস জার্মানির অধীনস্ত থাকাকালীন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরা টাওয়ারের লিফটের তার কেটে দেয়। ফলস্বরূপ অ্যাডলফ হিটলারকে পদব্রজে চূড়ায় উঠতে হয়েছিল। তখন এমনটি বলাবলি হত যে, হিটলার ফ্রান্স বিজয় করলেও আইফেল টাওয়ার বিজয় করতে পারেননি। প্রতিদিন অজস্র মানুষ আসেন আইফেল টাওয়ার দেখতে। ২০০২ সালের ২৮ নভেম্বর টাওয়ার-দর্শকের সংখ্যা ২০০,০০০,০০০ পূর্ণ হয়।

এ প্রি ল ক থা

কোভিড ১৯-এর জন্য এখন আমরা প্রায় প্রতিদিনই শুনছি হু-র বা ডব্লিউএইচও-র কথা। যার বাংলা নাম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল। এই তারিখটি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এটি জাতিসংঘের এক বিশেষ সংস্থা। এই সংস্থা আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যের জন্য কাজ করে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংবিধান, সংস্থাটির গভর্নিং বা প্রশাসনিক কাঠামো এবং নীতি স্থাপন করে। এর প্রধান উদ্দেশ্যটি 'সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সকল মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা'। প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশ্বব্যাপী ৬-টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ১৬০-টি গুরুত্বপূর্ণ শাখা দপ্তর রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের প্রথম বৈঠকটি ২৪ জুলাই ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিস্তৃত কাজের মধ্যে রয়েছে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার পক্ষে পরামর্শ দেওয়া। জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া সমন্বয় করা এবং মানবস্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্যের প্রচার করা। এটি দেশগুলিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য

World Health Organization

মান এবং নির্দেশিকা নির্ধারণ করে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য জরিপের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে। বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলির বিশেষজ্ঞ দ্বারা মূল্যায়ন এবং সমস্ত জাতির স্বাস্থ্যের পরিসংখ্যান সরবরাহ করে। হু নানা স্বাস্থ্য সম্মেলন এবং আলোচনার ফোরাম হিসেবেও কাজ করে।

সংস্থাটি বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য সাফল্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৪-টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। হু ৩৪ জন স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত একটি এক্সিকিউটিভ বোর্ডকে নির্বাচন করে তাদের পরামর্শ দেয়। এর বার্ষিক সম্মেলন এবং মহাপরিচালক নির্বাচন, লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং ডব্লিউএইচও-র বাজেট এবং কার্যক্রম অনুমোদিত করার জন্য দায়বদ্ধ। এর বর্তমান মহাপরিচালক হলেন টেড্রস আধানোম ইথিয়োপিয়ার প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তহবিল আসে সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে এবং বেসরকারি দাতাদের কাছ থেকে। ২০১৮ সালের হিসেবে হু-র বাজেট ছিল ৪.২ বিলিয়ন ডলার।

মে ক থা

৬ মে ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক সিগমুন্ড ফ্রয়েড। ফ্রয়েড ছিলেন একজন অস্ট্রীয় মানসিক রোগ-চিকিৎসক এবং মনস্তাত্ত্বিক। তিনি 'সাইকোঅ্যানালিসিস' বা 'মনঃসমীক্ষণ' নামের মনোচিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবক। ফ্রয়েড মনোবীক্ষণের জনক হিসেবে পরিগণিত। তাঁর বিভিন্ন কাজ জনমানসে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। মানবসত্তার 'অবচেতন', 'ফ্রয়েডীয় স্খলন', 'আত্মরক্ষণ প্রক্রিয়া' এবং 'স্বপ্নের প্রতীকী ব্যাখ্যা' প্রভৃতি ধারণা জনপ্রিয়তা পায়। একইসঙ্গে ফ্রয়েডের বিভিন্ন তত্ত্ব সাহিত্য, চলচ্চিত্র, মার্ক্সবাদী আর নারীবাদী তত্ত্বের ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' ও 'ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স' নামের মতবাদসমূহের জন্য অধিক আলোচিত।

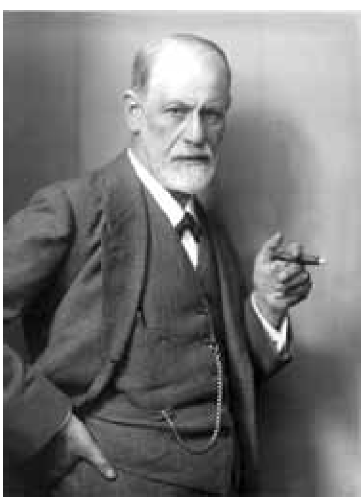

১৯০০ থেকে ১৯৩০-এর দশক, অর্থাৎ তাঁর চুয়াল্লিশ বছর বয়স থেকে আশি, এই সময়টায় ফ্রয়েড পরিণত হয়েছিলেন কিংবদন্তিতে। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এমন সব তত্ত্বের বই, যা পড়ে চমৎকৃত হয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা, তাক লেগে গেছে মধ্যবিত্ত সমাজের। তিনিই বলেন, মানুষের মনের মধ্যে আছে অজানা অচেনা এক অবচেতন, যার সিংহভাগ জুড়ে নানান গোলমেলে যৌন ইচ্ছে, ভীতি আর হিংসার প্রবণতা! পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে ভিয়েনার ১৯ নম্বর বের্গেসির, যা কিনা ফ্রয়েডের বসতবাটি এবং ক্লিনিক, ঠিকানায় আসেন রোগীরা। মুগ্ধ হয় তাঁর ক্যারিশমায়। ফ্রয়েড নিজেকে বিজ্ঞানীর চেয়ে বেশি একজন কনকুইস্তাদর বলে ভাবেন— অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় এক মানুষ, যে অতিক্রম করতে চায় একের পর এক বাধা। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ভিয়েনাবাসী তাঁকে জেনেছেন একজন সহানুভূতিশীল, সংস্কৃতিমনস্ক, বিত্তবান, তীক্ষ্ণ মেধার মানুষ বলে, নিজের সামাজিক প্রতিপত্তি বিষয়ে যিনি সজাগ। এই মানুষটির মৃত্যু ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে।

জু ন ক থা

১৯৩৮ সালে এই জুন মাসেই আবির্ভাব হয় একটি কাল্পনিক চরিত্রের, যে পরবর্তীকালে দুনিয়াজুড়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চরিত্রটিকে আমরা সবাই চিনি। তার নাম সুপারম্যান। একটি কাল্পনিক কমিক চরিত্র। এর মূল সৃষ্টি ১৯৩২ সালে, মার্কিন লেখক জেরি সিগাল এবং জোই শাস্টারের কল্পনায়। পরে, ১৯৩৮ সালে, তাঁরা ডিটেকটিভ কমিকস (বা ডিসি কমিকস)-এর কাছে তাঁদের গল্পের স্বত্ব বিক্রি করে দেন। চরিত্রটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালের জুন মাসে অ্যাকশন কমিকসের প্রথম সংখ্যায়। পরবর্তীকালে চরিত্রটি এমনই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, নানান রেডিয়ো চ্যানেল, টেলিভিশন সিরিয়াল, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্রের স্ট্রিপ বা ভিডিয়ো গেমে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সুপারম্যান তার ব্যাপক সাফল্যের মাধ্যমে সুপারহিরো সিরিজের এক নতুন ধারা চালু করে। চরিত্রের পোশাকটি বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। কেননা, গ্রহান্তরের শারীরিক আকারটি আচ্ছাদনের জন্য দরকার ছিল বিচিত্র এক পোশাক। লাল, নীল ও হলুদের মিশ্রণে তৈরি সেই পোশাকটি আজ অতি বিখ্যাত, যার বুকে S ফলকটি লেখা আছে।

কমিকটির কাহিনি অনুযায়ী সুপারম্যান ক্রিপটন গ্রহে জন্মগ্রহণ করে। সে-সময় তার নাম ছিল ক্যাল-এল। ক্রিপটন গ্রহটি ধ্বংস হবার আগের মুহূর্তে তার বাবা তাকে ছোট্ট মহাকাশযানে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। আমেরিকার ক্যানসাস শহরের এক কৃষক ও তাঁর স্ত্রী তাকে খুঁজে পান। সেখানে সে ক্লার্ক কেন্ট নামে শৃঙ্খলার সঙ্গে বড়ো হতে থাকে। ছোটোবেলা থেকেই তার নানা অতিমানবীয় ক্ষমতা দেখা যায়। তার পার্থিব বাবা-মা ক্লার্ককে অতিমানবীয় ক্ষমতা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে উৎসাহ দেন। এবং বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লার্ক কেন্ট সুপারম্যান নাম নিয়ে তার অপরিসীম ক্ষমতার সাহায্যে মানুষের উপকার করতে থাকে। ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত সুপারম্যান সিরিজের গল্পগুলোর এমনই জনপ্রিয়তা ছিল যে, পরবর্তী সময়ে প্রতিটি সুপারহিরোকে যাচাই করা হয়েছে সুপারম্যানের তুলনা দিয়ে। ■

সব পরিবারেরই কিছু বলবার কথা থাকে, যে-কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। আল-আমীন পরিবারেরও আছে তেমন কিছু কথা, কিছু খবর। এই বিভাগে সেইসব সমাচার।

দু-দিনের আল-আমীন উৎসব পালিত খলতপুরে

শীতের সন্ধ্যা নামার মুখে সব পাখি ফিরে যাচ্ছে যখন, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের স্বপ্নভূমি আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীরা তখন দু-দিনের আল-আমীন উৎসব শেষে ফিরে যাচ্ছিল একবুক প্রত্যয় আর দু-চোখে আগামীর স্বপ্ন এঁকে নিয়ে। যে-স্বপ্নের বীজ দু-দিন ধরে আল-আমীন মিশনের মেধাচাষের উর্বর জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী আমন্ত্রিত অতিথিরা। ২৫-২৬ জানুয়ারি, এই দু-দিন ধরে এ-বছরের আল-আমীন উৎসব অনুষ্ঠিত হল আল-আমীন মিশনের প্রধান শাখা হাওড়ার খলতপুরে। প্রজাতন্ত্র দিবসে, শেষ দিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈকত মৈত্র ও ফিনান্স অফিসার রবীনকুমার দত্ত, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং কল্যাণ দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর সাহিদ আলম, নিউটাউন-কলকাতা উন্নয়ন পর্ষদের অর্থ বিভাগের ডিরেক্টর আফসার আলম, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জেনারেল ম্যানেজার মহম্মদ সামসুর রহমান। প্রথম দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ড. সেখ মহম্মদ হাসান, এম এ রসিদ, সেখ মহম্মদ আলি, কাজী আব্দুল বসির, নুরুল আনোয়ার ও আবু সালেহ মহম্মদ রেজওয়ানুল করিম এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী আব্দুর রহমান ও শাহজাহান মোল্লা প্রমুখ। আল-আমীন উৎসব আদতে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স, ডব্লিউ.বি.সি.এস.-সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় উজ্জ্বলতর সফল ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের

পুনর্মিলন উৎসব হলেও তা অনন্যতা লাভ করে বিশিষ্ট মানুষদের আগমন ও উৎসাহপ্রদানকারী সমৃদ্ধ বক্তৃতায়। স্বাগত ভাষণে আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম উৎকৃষ্ট যে-মানবজীবন, তা লাভ করার জন্য নেওয়ার বদলে দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করেন। উপাচার্য সৈকত মৈত্র মনোমুগ্ধকর বক্তব্যে বলেন, দেশের সব রাষ্ট্রপতির মধ্যে এ পি জে আবদুল কালামকে বেশি মনে রাখবেন মানুষ। তার কারণ জানাতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাঁর ভরপুর প্রাণশক্তির রহস্য কী? তিনি বলেছিলেন, কোনো মানুষকে যখন দেখি তখন ভাবতে শুরু করি তাঁর জন্য আমি কী করতে পারি। কিন্তু আমরা ভাবি ঠিক উলটো, মানুষটার থেকে কী নিতে পারি। বড়ো মানুষ হওয়ার দিক্‌নির্দেশ করার পাশাপাশি সফল হতে গেলে মাঝে মাঝে করাতে শান দিয়ে গাছ কাটার মতো দক্ষতায় ক্রমাগত শান দেওয়ার পরামর্শ দেন। মেহেবুব রহমানের জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিয়ে শুরু হয়েছিল দিনটা, শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকের রক্তদানে প্রজাতন্ত্র দিবস অনন্য হয়ে রইল এ-বছর। এ ছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম ও সুপারিন্টেডেন্ট এম আব্দুল হাসেম মল্লিক। সভার সঞ্চালক দিলদার হোসেন।

নিউটাউনে প্রাক্তনীদের সংবর্ধনা

ভাঙড় ও নিউটাউন শাখায় যৌথ পুনর্মিলন উৎসব ২০২০। নিউটাউন শাখার হজ্ব হাউসে অনুষ্ঠিত ওই উৎসবে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সফল ১৪৪ জন প্রাক্তনীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রাক্তনীরা একত্রিত হতে পেরে এবং সম্মান পেয়ে উজ্জীবিত হন। মঞ্চে ফুটে ওঠা সাফল্যের ওই ছবি দেখে মিশন-পরিবারের কর্তারা যেমন গর্বিত বোধ করেছেন, তেমনই অনুপ্রাণিত হয়েছে সামনের আসনে বসে থাকা আগামীর ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়াররা। সঙ্গে অতিরিক্ত উৎসাহ জুগিয়েছে সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের বক্তব্য। তিনি পড়ুয়াদের উদ্দেশে বলেন, "পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা। দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সহযোগী হয়ে উঠেছে তারা।" এই সাফল্যের প্রমাণ, বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়ে বেড়েই চলেছে। শেষ দিনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ নাদিমুল হক, বিশেষ অতিথি কাবা শরিফের কোরআন প্রশিক্ষক ক্বারী মেকরাদ আল সাজিদ, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জেনারেল ম্যানেজার মহম্মদ সামসুর রহমান ও হাসিব আলম-সহ মিশনের অন্যান্য শিক্ষক।

করোনা মোকাবিলায় প্রাক্তনীরা

কলকাতার একটি বড়ো হাসপাতালে নিকট আত্মীয়কে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরনে ছিল লুঙ্গি। উচ্চশিক্ষিত হয়েও লুঙ্গির পরিচয়ে সংখ্যালঘু মুসলমান, তাই উপেক্ষা-অবহেলার শিকার হয়েছিলেন। সেই তরুণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নিজের সমাজকে সম্মানের জায়গায় নিয়ে যাবেন। প্রায় চার দশক ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিনি দেখছেন, আজ এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণে মহামারির কবলে পড়া মানুষকে বাঁচাতে দিনরাত এক করে পরিষেবা দিচ্ছেন তাঁরই হাতে গড়া সেই উপেক্ষিত সমাজের শত শত ছেলে-মেয়ে। সব মানুষ যখন প্রাণ বাঁচাতে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, তখন প্রাণ বাজি রেখে মানুষের নিরলস সেবা করছেন তাঁর 'ছেলে-মেয়েরা'। এ-কথা বলতে বলতে গলা ধরে আসে ষাটোর্ধ্ব বয়সে পৌঁছোনো সেই তরুণের। তিনি, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর পথপ্রদর্শনকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-আমীন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। আল-আমীন মিশনের মোট প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী প্রায় ২৫ হাজার। এর মধ্যে এম.বি.বি.এস., বি.ডি.এস., নার্সিং, হোমিয়োপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, প্যারামেডিকেল-সহ স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত আছেন বা পড়ছেন প্রায় ছয় হাজার ছাত্র-ছাত্রী। সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরেও আছেন বহু ছেলে-মেয়ে। এই কয়েক হাজার ছেলে-মেয়ে জরুরি পরিষেবা দিয়ে করোনা সংকটের মোকাবিলা করছেন নিজেদের প্রাণ বাজি রেখে। এইসব লড়াকু ছেলে-মেয়েদের একজন চিকিৎসক তাহেরা খাতুন। তিনি এই সংকটকালে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানালেন, "এই বিপদের দিনে বাবা-মা চাইছেন আমি বাড়িতে থাকি। আমার মন চাইছে আমি বাড়িতে থাকি, কারণ, আমার দুগ্ধপানকারী শিশুসন্তান আমার পথ চেয়ে কাঁদছে দিনের পর দিন। কিন্তু একজন ডাক্তার হিসেবে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমি ঘরে থাকতে পারি না।" এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের লড়াইকে উৎসাহিত করা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করোনা মোকাবিলায় অতুল্য ভূমিকা পালনকে সম্মান জানাতে তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে আল-আমীনের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীগণ তাঁদের এক দিনের বেতন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ-তহবিলে দান করলেন। আল-আমীন মিশনের উদ্যোগে সংগৃহীত সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে আল-আমীন মিশনের দুটি ক্যাম্পাস কোয়ারিন্টাইন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক জানালেন, "মিশনের ছেলে-মেয়েরা যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সেবায়, আমাদের দেশের সেবায় বিপদের দিনে কাজে লাগছে, এরচেয়ে বড়ো আনন্দের কিছু হতে পারে না।"

করোনাতেও সচল আল-আমীন

বিপজ্জনক নভেল করোনা ভাইরাসের দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়াকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অতিমারি বলে চিহ্নিত করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফেও এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য নানান প্রতিবিধান দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশের এই কঠিন সময়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং সরকারি নির্দেশনামা মেনে মিশনের আবাসিক ব্যবস্থা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ার পাশাপাশি মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিরত ছাত্র-ছাত্রীদেরও বাড়ি পাঠানো হয়েছে। সমস্যাসংকুল এই সময়েও ইন্টারনেট ও সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মিশনের যাবতীয় কাজকর্ম সচল রয়েছে।

মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, "করোনা ভাইরাসের এই সমস্যা কবে মিটবে আমরা জানি না। তবে সরকার বা প্রশাসনের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে মানুষ যদি সচেতনতার সঙ্গে এই কঠিন লড়াইয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখেন এবং অন্যকে সুরক্ষা প্রদান করেন, তাহলে আমরা আশাবাদী করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক থেকে আক্ষ্মরা সকলেই দ্রুত পরিত্রাণ পেতে পারি।" সেইসঙ্গে তিনি আরও জানান, "আমরা আমাদের কর্মপ্রণালীতে প্রচলিত পদ্ধতির বদলে বিকল্প ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। অন্যথায় আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম খুব বেশি বাধাপ্রাপ্ত হলে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে পড়ব।" প্রথমত, সম্প্রতি প্রকাশিত ইংরেজি মাধ্যমের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির সফল ছাত্র-ছাত্রীদের স্থগিত রাখা ইন্টারভিউ সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে-সহ অভিভাবকদের মিশনের মূল ক্যাম্পাস খলতপুরে সশরীরে আসার দরকার হয়নি। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা মাধ্যমের একাদশ শ্রেণির প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ২০ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে। ইন্টারভিউ ও কাউন্সেলিং হয়েছে অনলাইনেই। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপ অনলাইনে যেভাবে করা হয়েছিল, সেভাবেই মিশনের ওয়েব-সাইটে কাউন্সেলিঙে অংশ নেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। এখান থেকে বাছাই করা ছাত্র-ছাত্রীরা মিশনের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়।

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার (ইন্টারভিউ) ও কাউন্সেলিঙের বদলে ইন্টারনেট মাধ্যমের এই পদ্ধতিতে বিড়ম্বনার সম্ভাবনাও আছে। কারণ, রাজ্যের সমস্ত জায়গায়, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেটের স্পিড ও সুযোগসুবিধা সমমানের নেই। সেসব ক্ষেত্রে ফোনের মাধ্যমে ইন্টারভিউ করা হয়। উদ্ভূত সমস্যা মিটে গেলে যাঁদের এই মাধ্যমে সমস্যা হচ্ছে, তাঁদের জন্য মিশনের যেকোনো ক্যাম্পাসের অফিসে বসে ইন্টারভিউ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল। উল্লেখ্য, মিশনে রাজ্যের প্রান্তিক পরিবারের কয়েক হাজার দুঃস্থ ও এতিম ছেলে-মেয়ে বিনামূল্যে পড়াশোনা করে থাকে।

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়াশোনা করানো ছাড়াও মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডব্লিউ.বি.সি.এস. প্রভৃতি প্রবেশিকা পরীক্ষার কোচিং দিয়ে থাকে মিশন। বিশেষ করে মেডিকেলের সাফল্যে আল-আমীন মিশনের অবস্থান একেবারে শীর্ষে। মিশনের বদান্যতায় বেশ কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী ইতোমধ্যেই ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। ৩ মে সর্বভারতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট)-র জন্য জোর কদমে প্রস্তুতি চলছিল ছাত্র-ছাত্রীদের। কিন্তু তাদেরকে বাধ্য হয়ে নিজ নিজ বাড়ি চলে যেতে হয়েছে। তবে এই পরিস্থিতিতেও তাদের প্রস্তুতি ও মনোবলকে চাঙ্গা রাখতে

ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়েছে মিশন। অনলাইনে ক্লাস, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে স্টাডি মেটিরিয়াল ও প্রশ্নের উত্তর পাঠানো, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস প্রভৃতিতে পুরোদমে সক্রিয় মিশন। আল-আমীন মিশনে ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইন ক্লাস চালু থাকার পাশাপাশি মিশনের অফিসিয়াল কাজকর্ম চলছে পূর্ণ মাত্রায়।

সূর্যপুর শাখায় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অন্যান্য বছরের ন্যায় এ-বছরও আল-আমীন মিশন একাডেমী, সূর্যপুর শাখায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ শনিবার সাড়ম্বরে পালিত হয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা সভা। ওই দিনই এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মিশনের ছাত্র ও শিক্ষক-অশিক্ষক সদস্যবৃন্দের মিলিত প্রয়াসে বেলা ১২ টার মধ্যে একশো জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। ওই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের অ্যাডিশনাল এসপি ইন্দ্রজিৎ বসু। বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মহ. মেহেদি কালাম; এম এ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক নাসিরুদ্দিন মণ্ডল ও সভাপতি মহিউদ্দিন সরকার; মহ. কুতুবুদ্দিন খান, ডি.এস.পি. (ট্রাফিক), বারুইপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট; মহ. মোশারফ হোসেন, বি.ডি.ও., বারুইপুর ব্লক; মহ. রবিউল হক, জয়েন্ট বি.ডি.ও., বারুইপুর ব্লক; ইউনুস সর্দার; অনিন্দ্য ব্রহ্মচারী; আফসার আলি লস্কর প্রমুখ। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের কেরাত পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কেলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন। এ-দিনের অনুষ্ঠানে আল-আমীন মিশনের এই শাখা থেকে কোচিং নেওয়া WBJEE-২০১৯ এবং NEET-২০১৯ পরীক্ষায় সফল ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হয়। এ ছাড়াও ২০১৯ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৪ জন ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্ররাও পুরস্কৃত হয়। প্রতিবারের ন্যায় এ-বারও ছাত্রদের দেওয়াল-পত্রিকা ‘কারুবাকি’ প্রকাশিত হয়। এ-বছরের থিম ছিল ‘সেভ ওয়াটার সেভ লাইফ’। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অধ্যাপক ড. মহ. মেহেদি কালাম মিশনের ছাত্রদের উদ্‌বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও বর্তমান সামাজিক মূল্যক্ষয়ের কথা উল্লেখ করেন। মহ. কুতুবুদ্দিন খান ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, তাদেরকে আরও বেশি পরিশ্রমী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। তাদেরকে আরও অনেক বেশি ও অনেক বড়ো স্বপ্ন দেখতে হবে এবং ত্যাগ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে লক্ষ পূরণ করতে হবে। আল-আমীন মিশনের প্রাণপুরুষ এম নুরুল ইসলাম মিশনের উত্থান ও সফলতার কথা তুলে ধরেন। তাঁর জীবনের দেখা স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নপূরণের গল্প শোনান ছাত্রদের। সভার সভাপতি মহিউদ্দিন সরকার সমাপ্তি ভাষণ দেন এবং ছাত্রদের সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্ররা আবৃত্তি, গান ও নাটক পরিবেশন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ইন-চার্জ সেখ রাজীব হাসানের নেতৃত্বে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সবাই মিলে সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন।

চুরুলিয়ার নজরুল অ্যাকাডেমিতে এম নুরুল ইসলাম

২৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবণী থানায় মিশনের কেলেজোড়া শাখায় ছিল বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নতুন বিদ্যালয়ভবনের শুভ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে কেলেজোড়ায় ২০০৬ সালে নজরুল সেবা সমিতির দানকৃত জমিতে আল-আমীনের প্রাইমারি বিভাগ শুরু হয়। বর্তমানে এই আল-আমীন একাডেমি, কেলেজোড়ায় পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ১০৮ জন আবাসিক ছাত্র অধ্যয়নরত। আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের আগমনে এলাকাবাসীর মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বারাবণী কেন্দ্রের বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় মিশনের শিক্ষা প্রসারের প্রশংসা করেন। তিনি পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করেন এবং পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। এলাকার বিডিও সুরজিৎ ঘোষ ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, নিয়মানুবর্তিতাই সাফল্যের চাবিকাঠি। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাবণী থানার অফিসার ইন-চার্জ অজয়কুমার মণ্ডল। আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ড. সেখ মহম্মদ হাসান পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতনার ওপর গুরুত্ব দেন।

এম নুরুল ইসলাম বক্তব্যের শুরুতে এলাকার সেইসব মহৎপ্রাণ পৃষ্ঠপোষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান, যাঁদের জমির ওপর এই প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে আছে। সেইসঙ্গে শিক্ষাবিস্তারে এলাকার শিক্ষাপ্রেমীদেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি এই ক্যাম্পাসের স্কুল বিল্ডিঙের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এটির নাম কাজী নজরুল ইসলাম ভবন হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ও মিশন পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী হাসিব আলম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদ সদস্য অসিত সিং, পুঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুকুমার মাল, নজরুল অ্যাকাডেমির সম্পাদক কাজি রেজাউল করিম, নজরুল সেবা সমিতির পক্ষে সেখ সাকিরুদ্দিন, সেখ সাজাহান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, শিক্ষাদরদী গ্রামবাসী, মিশনের শুভাকাঙ্ক্ষী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া প্রমুখ।

২০১৬ সালে অ্যাকাডেমির পক্ষে এম নুরুল ইসলামকে চুরুলিয়ার নজরুল অ্যাকাডেমিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু সে-সময় তিনি সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। কেলেজোড়ায় তিনি আসছেন শুনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক কাজি রেজাউল করিম। তাঁরই আহ্বানে ওই দিন সন্ধ্যায় নজরুল অ্যাকাডেমিতে তিনি উপস্থিত হন। এই শুভক্ষণকে স্মরণীয়

করে রাখতে কাজি রেজাউল করিম নজরুল অ্যাকাডেমির পক্ষে স্মারক তুলে দেন এম নুরুল ইসলামের হাতে। নজরুল অ্যাকাডেমির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এম নুরুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেন। এ ছাড়াও তিনি এখানকার সংগ্রহশালা ও সমস্ত কিছু ঘুরে দেখেন।

আল-আমীন মডেল স্কুলের অনুষ্ঠান

হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে আল-আমীন এডুকেশন কাউন্সিল পরিচালিত আল-আমীন মডেল স্কুল সোনাতলার নবনির্মিত বেগম সাইদা স্মৃতি ভবনের ১৪ ফেব্রুয়ারি শুভ দ্বারোদ্ঘাটন হয়ে গেল। দ্বারোদ্ঘাটন করেন আল-আমীন এডুকেশন কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে উদয়নারায়ণপুরের সোনাতলা গ্রামের মুসলমান পাড়ার বিগত ৫০ বছরের শিক্ষণ-চিত্র বর্ণনা করেন সেখ সোফিয়ার রহমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ-বছরও এই পাড়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২ জন। যার মধ্যে ৩২ জন বালিকা। এই সকল পরীক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার পর তাদের হাতে ফুল, পেন তুলে দেন এম নুরুল ইসলাম এবং গত শিক্ষাবর্ষের উচ্চ-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল পরীক্ষার্থীদের আক্তার হোসেন মেধা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাসিমা পারভিন, আলমগীর বিশ্বাস,

আশরাফুল হোসেন, সেখ আরশেদ আলি, জমিদাতা সেখ সফিউদ্দিন-সহ বিশিষ্টরা। সভা সঞ্চালনা করেন সেখ মোমিনুর রহমান।

একই দিনে আল-আমীন মডেল স্কুল খলতপুর-এর নতুন ভবন নির্মাণের এবং একটি এতিমখানা (শান্তিনীড়)-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় একান্ত ঘরোয়া ও আন্তরিক দোওয়ার মজলিশের মাধ্যমে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আল-আমীন এডুকেশন কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আইএএস এইচ এ আরাফি, আলহাজ্ব সেখ মারুফ আজম, এম আব্দুল হাসেম মল্লিক, নাসিমা পারভিন, নুরুল আলম, আশরাফুল হোসেন, আলমগীর বিশ্বাস, জামালুদ্দিন মল্লিক প্রমুখ।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইন পরীক্ষায় সাফল্য

ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) আয়োজিত সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইন পরীক্ষা ৭ ও ৯ জানুয়ারি ২০২০-তে অনুষ্ঠিত হয়। এক সপ্তাহ পর ১৭ জানুয়ারি এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীরা এই পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল করে মিশনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। পার্সেন্টাইল স্কোর ৭০ বা তার বেশি করেছে মিশনের মোট ৫৬ জন, ৮০ বা তার বেশি স্কোর করেছে ৩৮ জন এবং ৯০ বা তার বেশি স্কোর করেছে ২০ জন। মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে

সাকিল আহমেদ গাজি
নম্বর ৯৭

রিজওয়ানুজ্জামান মোল্লা
নম্বর ৯৭

ইমন রাজ
নম্বর ৯৬

সেখ সরিফুল ইসলাম
নম্বর ৯৪.৯

কাসিদ আক্তার
নম্বর ৯৪.৫

সর্বোচ্চ স্কোর ৯৭.০৮ করেছে পাঁচুড় শাখার সাকিল আহমেদ গাজি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে খলিশানি শাখার রিজওয়ানুজ্জামান মোল্লা ও খলতপুর শাখার ইমন রাজ। এ ছাড়াও যারা খুবই ভালো স্কোর করেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে খলতপুর শাখার সেখ সরিফুল ইসলাম, মুস্তাকিম আলি মল্লিক, কাসিদ আক্তার, সূর্যপুর শাখার মহ. ফিরোজ আহমেদ, মহ. নাসিবুর রহমান, পাঁচুড় শাখার তাবিবুল ইসলাম, নয়াবাজ শাখার তামিম লস্কর, আল-আমীন স্টাডি সার্কলের কুন্তল দাস, উলুবেড়িয়া শাখার শেখ জসিমুদ্দিন, সোনিয়া দুবে প্রমুখ।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উস্থি থানার মহেশদাড়ি গ্রামের প্রান্তিক কৃষক কামালউদ্দিন গাজি ও গৃহবধূ এসমতআরা বিবির সন্তান সাকিল আহমেদ গাজি হাসনেচা শাখায় নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২০১৮ সালে ওই শাখা থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯০.৭১ শতাংশ নম্বর পাওয়ার পর একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে পাঁচুড় শাখায় ভর্তি হয়। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সাকিল আহমেদ সম্প্রতি প্রকাশিত জেইই (মেইন) পরীক্ষায় মিশনের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে।

বীরভূমের নলহাটি থানার বাড়শোর গ্রামের প্রান্তিক ও দুঃস্থ পরিবারের বদিউজ্জামান মোল্লা ও দিলারা বিবির পুত্র রিজওয়ানুজ্জামান মোল্লা ছোটোবেলা থেকেই দারুণ মেধাবী। মাধ্যমিকে ৯৪.৮ শতাংশ ও উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৯ শতাংশ নম্বর পায় সে। মিশনের খলিশানি শাখায় জয়েন্টের কোচিং নিয়ে সে স্কোর করেছে ৯৭.২।

উত্তর চব্বিশ পরগনার ঘুনি গ্রামের মহ. ফিরোজ আহমেদ মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে যথাক্রমে ৮৩.৪৩ শতাংশ ও ৭৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। সূর্যপুর শাখায় জয়েন্টের কোচিং নিয়ে স্কোর করেছে ৯৪.৫৯। নিজের অদম্য অধ্যাবসায় ও মিশনের শিক্ষকদের ক্রমাগত উৎসাহদানে তার এই অর্জন বলে জানায় সে। উল্লেখ্য, তার দিদি ইসমতআরা খাতুন মিশনে পড়াশোনা করে বর্তমানে এম.বি.বি.এস. পাঠরত এবং ভাই মহ. রাইহান মিশনেই পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে।

মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ক্রিকেটভক্ত মহ. নাসিবুর রহমান মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২০১৮ সালে ৮২.৫৭ শতাংশ নম্বর পায়। বর্তমানে সে সূর্যপুর শাখায় বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি গণিত অনুশীলনে তার আগ্রহ চোখে পড়ার মতো।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার সাইয়েদ বরকাতুল্লা ও হালিমা বেগম সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে ভীষণ সচেতন। তাঁদের আশা ছিল ছেলে সাইয়েদ পারভেজ রহমান আল-আমীনে পড়াশোনা করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সে-আশা আজ পূরণের পথে। মাধ্যমিকে ৯১.৮ শতাংশ নম্বর পাওয়া পারভেজ মিশনের খলিশানি শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৯ শতাংশ নম্বর পায়। সূর্যপুর শাখায় জয়েন্টের কোচিং নিয়ে তার বর্তমান সাফল্য বলে জানায় সে। নানা ধরনের বই পড়তে আগ্রহী পারভেজ জানায়, মিশনের পড়াশোনার পরিবেশ খুবই উপযোগী।

দেশের এনআইটি ও আইআইটি-তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। তিনি সফল ছাত্র-ছাত্রী-সহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শাখাপ্রমুখদের মুবারকবাদ জানিয়েছেন।

ইন্দোরে শুরু ইংরেজি মাধ্যম শাখা

সুযোগসুবিধাহীন, মুখ্যত গ্রামীণ মেধাবী ছেলে-মেয়েদের আবাসিক পরিবেশে গুণমানসম্পন্ন শিক্ষায় সাফল্যের সহায়ক হিসেবে তিন দশক ধরে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে আল-আমীন মিশন। বাংলা মাধ্যমের এই কর্মধারার পাশাপাশি শুরু হয়েছে মিশনের ইংরেজি মাধ্যমের পঠনপাঠন। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া শিলিগুড়ির আল-আমীন মিশন একাডেমি, মিলনমোড় শাখাই মিশনের ইংরেজি মাধ্যমের প্রথম ক্যাম্পাস। অভিভাবকদের চাহিদা ও সময়ের দাবিকে সামনে রেখে রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে আল-আমীন মিশনের ইংরেজি মাধ্যমের শাখার ক্রমশ প্রসার ঘটছে। মিলনমোড় (৫ম-১০ম) ছাড়াও রাজ্যে বীরভূম (৫ম-১০ম), খড়্গাপুর (৫ম-১২শ-বিজ্ঞান), শিলিগুড়ি (৭ম-১২শ-বিজ্ঞান) ও প্রতিবেশী রাজ্যের পাটনা (১১শ-১২শ-বিজ্ঞান), রাঁচি (১১শ-১২শ-বিজ্ঞান) এবং এ-বছর ইন্দোরের পাকিজা এডু গ্রুপ-এর সহযোগিতায় শুরু হচ্ছে আল-আমীন মিশন একাডেমি, ইন্দোর শাখা। উল্লেখ্য, মিশনের সমস্ত শাখার পঠনপাঠনে সিবিএসই সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। শিলিগুড়ি ও পাটনার গার্লস ক্যাম্পাস ছাড়া অন্য সবগুলিই বয়েজ ক্যাম্পাস। দ্বাদশ শ্রেণির প্রত্যেক ক্যাম্পাসে একাদশ শ্রেণি থেকেই সিলেবাসের পাশাপাশি নিট ও জেইই কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। রাজ্যে আল-আমীনের সমস্ত ইংরেজি মাধ্যম শাখায় ৫ম-৯ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ৯ ফেব্রুয়ারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় অভিভাবকদের সাড়া ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ৮৪৫ জন, অর্থাৎ ১৪১ জন ছাত্রী ও ৭০৪ জন ছাত্র এই পরীক্ষায় বসে। ১৬ মার্চ থেকে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টারভিউ শুরু হয়। অন্যদিকে ইন্দোর শাখায় কেবলমাত্র ৮ম ও ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা মধ্যপ্রদেশের ১২-টি কেন্দ্রে ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৮১৬ জন পড়ুয়া পরীক্ষায় বসেছিল।

উল্লেখ্য, ২৮ ফেব্রুয়ারি আল-আমীন মিশন একাডেমি, বীরভূম ক্যাম্পাসের নবনির্মিত ভবনে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির সমস্ত ছাত্রকে মিশনের পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস থেকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ছোটো এক অনুষ্ঠানে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিকতার অনুশীলন এবং কঠোর পাঠাভ্যাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলার মতো ইংরেজি মাধ্যমেও আল-আমীনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার ফলে গত বছরের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির সিবিএসই-র আশানুরূপ ফল সম্ভবপর হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রবিউল ইসলাম (S.D.L. & L.R.O.)। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ড. সেখ মহম্মদ হাসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুর রহমান, অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন সেখ, অধ্যাপিকা ড. দিলরুবা খাতুন প্রমুখ।

কয়েক হাজার মানুষকে ত্রাণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান আল-আমীনের

সন্ধ্যার পর হস্টেলের ছাদে খোলা আকাশের নীচে ছেলেদের ডেকে নিয়ে বসতেন। বড়ো হওয়ার স্বপ্ন এঁকে দিতেন তাদের প্রিয় স্যার এম নুরুল ইসলাম। বলতেন, "তোমাদের মাঝে যেমন অনেক গরিব সহপাঠী আজকে মিশনে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে, তারা গ্রহীতা। এই গ্রহীতারাই একদিন দাতা হয়ে উঠবে। গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াবে।" প্রায় পঁয়তিরিশ বছর পর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন তাঁর দেখা সেই স্বপ্ন সফল করছেন ২৫ হাজার প্রাক্তনীর অনেকেই। ব্যক্তিগত স্তরে পরিবার-প্রতিবেশীদের পাশে থাকার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই তাঁদের লালনভূমি আল-আমীন মিশনের পাশে দাঁড়ান। ব্যক্তিগত স্তর ছাড়িয়ে সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে আল-আমীন মিশনের স্বপ্নকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ শুরু করেছেন আল-আমীন মিশনের বেশ কিছু প্রাক্তনী। প্রাক্তনীদের গড়ে তোলা আল-আমীনের স্বপ্ন-সহযোগী এরকম দুটি সমাজসেবী সংস্থা— নবদিগন্ত এবং উইথ ইউ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আল-আমীন মিশন, নবদিগন্ত এবং উইথ ইউ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সম্মিলিতভাবে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে, লকডাউন ও আমফান ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়া কয়েক হাজার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

বর্তমানে সারাবছর স্থায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে মিশনের প্রধান শাখা হাওড়ার খলতপুর থেকে। করোনা মহামারি রুখতে মার্চের শেষে শুরু হওয়া লকডাউনের ফলে রুজিরোজগার হারিয়ে পথে বসেছেন বহু মানুষ। ২০ মে রাজ্যে আছড়ে পড়া আমফান ঝড় দুর্দশা বাড়িয়েছে বহুগুণ। অর্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করা মানুষদের অনেকের মাথার ছাউনিটুকুও হারাতে হয়েছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে খাদ্যসামগ্রী, ওষুধ, পোশাক ইত্যাদি ত্রাণ হিসেবে নিয়ে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পথে নেমেছে ওই তিন সংগঠন। মূলত আল-আমীন মিশনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত

অংশগ্রহণ ও অনুদানে প্রায় একমাসব্যাপী পরিষেবা দেওয়ার একটি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে সুন্দরবন-সহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দুই চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, সোয়াবিন এবং ভোজ্যতেল ইত্যাদি মোট প্রায় ৫০০ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেট ও শুকনো খাবার তুলে দেওয়া হয়েছে প্রায় ১৬০০ পরিবারের হাতে। এ ছাড়া শাড়ি, বাচ্চাদের পোশাক, মশারি, স্যানিটারি ন্যাপকিন, মাস্ক, স্যানিটাইজার ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ প্রদানও করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গোসাবা, হিঙ্গালগঞ্জ, ন্যাজাট, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, জীবনতলা, হাড়োয়া এবং হাবরা প্রভৃতি অঞ্চলের বহু জায়গায় এইসব ত্রাণ ও পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫৩৫ জন মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। আল-আমীন মিশনের ডাক্তারদের সঙ্গে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়েছেন এইমস-এর চিকিৎসক অনির্বাণ দাশগুপ্ত ও অদিতি সাহা। রোগীদের প্রদান করা হয়েছে প্রায় দু-লক্ষ টাকা মূল্যের ওষুধ। আল-আমীন মিশনের এই প্রয়াসের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে রাঙাবেড়িয়া টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভলাপমেন্ট। উল্লেখ্য, ৭ জুন থেকে শুরু হওয়া মিশনের এই পরিষেবা ৫ জুলাই পর্যন্ত চলে। এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এম নুরুল ইসলাম জানালেন, "রামকৃষ্ণ মিশনের অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছিল আল-আমীন মিশন। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সেবা, এই তিন ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। তিন দশকের বেশি আল-আমীন মিশন শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার পর স্বাস্থ্য ও সেবা ক্ষেত্রেও কাজ শুরু করেছে। মানুষ আগামী দিনে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আল-আমীন মিশনকে দেখতে পাবেন।" ■

OUR ENGLISH MEDIUM CAMPUSES

Siliguri Boys Campus

Al-Ameen Mission Academy, Milonmore

Milonmore, Champasari, Siliguri, Darjeeling

Phone: 74790 10237, 97322 54976
e-mail: aammilonmore.eng2014@gmail.com
Level: V-X (10th standard)

Siliguri Girls Campus

Al-Ameen Mission Academy, Siliguri

Asrafnagar, Haiderpara, Jalpaiguri

Phone: 86979 78724
e-mail: aamasiliguri@gmail.com
Level: VII-XII (12th standard)

Malda Boys Campus

Al-Ameen Mission Academy Malda

Jalanga, Narayanpur, Malda

Phone: 96799 99682
e-mail: aamamalda355@gmail.com
Level: V-VII (10th standard)

Suri Boys & Girls Campus

Al-Ameen Mission School Birbhum

Chinpai, Suri, Birbhum

Phone: 79080 41684
e-mail: aamsbirbhum@gmail.com
Level: V-X (10th standard)

Kharagpur Boys Campus

Al-Ameen Mission Academy, Kharagpur

Sadatpur, Kharagpur, Paschim Medinipur

Phone: 98364 72114
e-mail: aamakharagpur@gmail.com
Level: V-XII (12th standard)

Budge Budge Boys Campus

Al-Ameen Residential Academy, Budge Budge

Birla More, Chandipur, Budge Budge, S 24 Parganas

Phone: 9735559961
e-mail: aarabudgebudge@gmail.com
Level: V-VII (10th standard)

Al-Ameen Mission Academy, Indore

An initiative of Al-Ameen Mission Trust, Kolkata in association with Pakiza Edu Group, Indore

Pakiza Knowledge City: Near Sai Vihar Colony, Jetpura (Dharmpuri)
Ujjain Road, Indore (MP), Phone: +91 8889995730, +91 8226000420
E-mail: indore.alameenmission@gmail.com
Level: VIII & IX (10th standard)

Al-Ameen Mission Institute for Education Research & Training

The Centre of Excellence under Al-Ameen Mission Trust

TURNING DREAM INTO REALITY

This project is under construction at New Town, Kolkata. It will provide residential coaching for Civil Services, NEET-UG & PG, JEE-IIT and IIM aspirants and will cater training to the teachers and administrative staffs of various academic institutions. The Research scholars will be provided accommodation and research facilities under one roof.

- **Site Area 2 Acre (8094 sq.mtr.)**
- **Total Built-up Area 2,44,586 sq. ft.**
- **Format of the Building B+G+7**

Al-Ameen Mission Academy

Residential English Medium Institution with CBSE Curriculum (Boys & Girls)

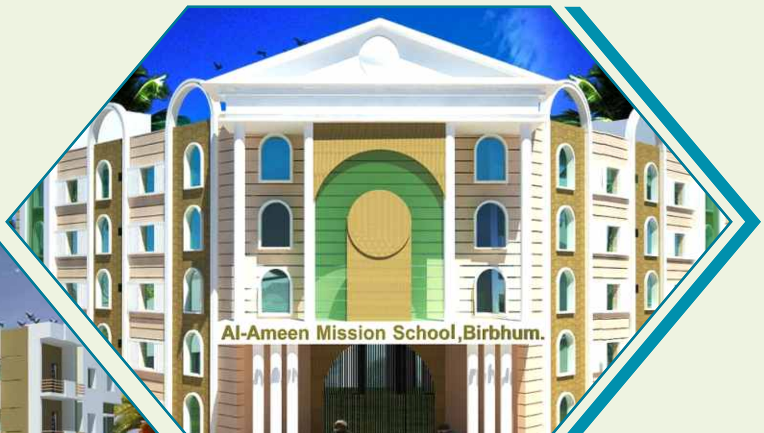

Run by **Al-Ameen Mission Trust**

City Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Mobile: 94332 73652
Central Office: DJ-4/9, New Town, Kolkata 700 156, Mobile: 83730 58720
Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Mobile: 97336 96050, West Bengal, Website: www.alameenmission.org